KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : ৪/7-8 ৪/9-10 ৪/11-12	Year of Publication : মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৮ চৈত্র-বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

(রবীন্দ্রনাথের Natalism in "Japan" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ)

জাপানের জাতীয়তা।

—:*:—

অবসাদের বন্ধনই সব চেয়ে গুরুতর বন্ধন—আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতার শৃঙ্খলে আমাদের চিরতরে শৃঙ্খলিত করে রাখে। আমরা পুনঃপুনঃ শুনছি যে এসিয়া অতীতের মধ্যে বাস করে। সমাধি মন্দির যেমন মৃতকে অমর করবার প্রয়াসেই তার ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করতে থাকে আমাদের অবস্থাটা ঠিক সেইরূপ। আমাদের মুখটা পীছুর দিকে ফিরে আছে বলে আমরা অগ্রসর হবার পথে আদৌ চলতে পারি না। আমরা এই অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েছি এবং নিজেরাও একে বিশ্বাস করতে সুরু করেছি। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লোক এই অভিযোগের হীনতায় একান্ত অধীর হয়ে নানারূপ আত্ম-প্রতারণার দ্বারা একে গর্ব্বের বিষয়ে পরিনত করবার ব্যর্থ অধ্যবসয়ে ব্যাপৃত হয়েছেন। কিন্তু এইরূপ গর্ব্ব লজ্জারই ছদ্মরূপ এ নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করে না।

যখন অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়িয়েছিল এবং আমরা যখন ভাবছিলাম এর ব্যতিক্রম হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, জাপান তখন তার স্বপ্ন থেকে উত্থিত হল এবং পুরাণ-কথিত দানবের ন্যায় এক পাদক্ষেপে শতাব্দীর নিশ্চেষ্টতাকে অতিক্রম করে বর্ত্তমান যুগের চরম সিদ্ধিকে অধিকার করে নিল। জড়তাকে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা বলে

ধরে নিয়ে এতদিন আমরা যে মোহে অভিভূত হয়ে ছিলাম এই ঘটনায় তা' দূর হয়ে গেছে। এই এসিয়ায় যে একদিন বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল, দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কলা যে একদা এই এসিয়ায় উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, জগতে যে কটি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে তাদের সব কয়টীর যে জন্মভূমি এই এসিয়া আমার একথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। অতএব এসিয়ার জল মাটির কোনও দোষ যে মানুষের চিত্তকে নিশ্চেষ্ট এবং গতি-শক্তিকে ক্ষীণ করে দেয় একথা কোনও মতেই বলতে পারা যায় না। পশ্চিম যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই পূর্ব্ব ভূখণ্ডে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হয়েছে। একে কখনই জড়-চিত্ত এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির লক্ষণ বলতে পারা যায় না।

তারপর হঠাৎ পূর্ব্বের আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। কালের প্রবাহ যেন সহসা থেমে গেল, আর এসিয়া যেন নূতন খাদ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়ে অতীতের চর্ব্বিতচর্ব্বন করতে আরম্ভ করে দিলে। এই নীরবতা মৃত্যুরই সমান। যে সত্য মানুষের জীবনকে যুগ যুগান্তর কলুষ হতে রক্ষা করে আসছে—যা বায়ুপ্রবাহের মত পৃথিবীকে চিরকাল স্নিগ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে, যে কণ্ঠ থেকে সেই মহাসত্য উদ্গীত হয়েছিল তা নীরব হয়ে গেল।

জীবনে নিদ্রা বলে একটী অবস্থা আছে। এই অবস্থায় আমরা সকল চেষ্টা থামিয়ে দিই—তখন আমাদের গতিশক্তি থাকে না, তখন আমরা নূতন খাদ্য গ্রহণ করি নে—জাগ্রত অবস্থায় যা খেয়েছি তারই রোমন্থন করে তখন আমরা জীবন যাপন করি। তখন আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি—আমাদের মাংসপেশী সকল শিথিল হয়ে

আসে, এই জড়তা নিয়ে মানুষ তখন আমাদের উপহাস করে। কিন্তু জীবন ছন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে যতির সঞ্চার করে তাকে নবীভূত করে নিতে হয়। জীবন সচেষ্ট অবস্থায় নিজেকে কেবলি ব্যয় করতে থাকে এই ব্যয় বরাবর একটানা চলতে পারে না বলে, তার পশ্চাতে পশ্চাতে এই নিশ্চেষ্ট অবস্থাটা অনুসরণ করে, এই অবস্থায় আমরা সকল ব্যয় থামিয়ে দিই এবং সকল চেষ্টা হতে বিরত হয়ে বিশ্রামের মধ্যে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করে নিই।

মানুষের মন বড়ই মিতাচারী। প্রতিপদে চিন্তা করবার ঝঞ্ঝাট এড়াবার তরে সে অভ্যাসের সৃষ্টি করে নেয় এবং তারই খাঁজে খাঁজে একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে থাকে। আদর্শ একবার গঠিত হয়ে গেলে মন আপনা আপনি অলস হয়ে পড়ে। তখন নূতন চেষ্টায় এর সঞ্চয়কে ভারমুক্ত করতে এ ভীত হয়। অভ্যাসের দুর্গের অন্তরালে এর সমস্ত গুণগ্রামকে আবদ্ধ করে দেওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে; কিন্তু এতে নিজেকেই নিজের সঞ্চয়ের ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ কৃপনতারই অনুরূপ। বর্দ্ধিষ্ণু এক পরিবর্ত্তনশীল জীবনের সংস্বর্গ থেকে আদর্শকে বিচ্ছিন্ন করলে তার সজীবতা নষ্ট হয়। নির্ব্বিঘ্নতার সীমার মধ্যে আদর্শের যথার্থ স্বাধীনতা থাকে না—নব নব চেষ্টার এবং নব নব অভিজ্ঞতার দায় সঙ্কুল পথেই তার স্বাধীনতা।

জাপান যখন একদিন তার প্রাচীন অভ্যাসের বেড়া ভেঙ্গে হঠাৎ বিজয়ীর মত বাহিরের জগতে বের হয়ে এল, সে দিন সমস্ত বিশ্ব বিস্ময়-চকিত নেত্রে তা' দেখে বস্তুতঃ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এটা এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হল যে, মনে হল সমস্ত ব্যাপারটী

যেন বেশ পরিবর্ত্তনের মতই একান্ত সহজ ও সরল এবং একে একটী নূতন দুঃসাধ্য সৃষ্ঠির মত একেবারেই মনে হল না। সে একই সময়ে পূর্ণতার এবং নবীনতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াল। এই ব্যাপারটীকে ইতিহাসের একটা খেয়াল অথবা মহাকালের ছেলে-খেলা বলে অনেকেই আশঙ্কা করে ছিল। অনেকেই একে সাবানের বুদ্বুদের মত অন্তসার-হীন বলে প্রথমটা অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু জাপান এটা চূড়ান্তভাবে প্রমান করে দিয়েছে যে তার এই ক্ষমতার বিকাশ একটা ক্ষণস্থায়ী স্ফূর্ত্তি মাত্র নয়—আজ সে যে কালের একটা আকস্মিক প্রবাহে প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশ্বের অঙ্গনে উত্থিত হয়েছে, পরমুহূর্ত্তেই আবার বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে এ তার নিয়তি নয়।

আসল কথা হচ্ছে—জাপান একই সময়ে প্রাচীনতা এবং নবীনতাকে পেয়েছে। পূর্ব্ব ভূখণ্ডের যে বৈদগ্ধ্য মানুষকে আত্মার মধ্যেই শক্তি এবং সম্পদের সন্ধানে প্রেরণ করে—বিপদ এবং ক্ষতির মুখে যা' মানুষকে ধৈর্য্য ধরবার উপদেশ দেয়—যা' মানুষকে নিষ্কাম আত্মত্যাগের বিধান দেয়, যার শিক্ষায় মানুষ সত্যের জন্য মৃত্যুকে অম্লান মুখে বরণ করে এবং বিচিত্র ও সামাজিক বাধ্যতাকে চিরজীবন বহন করে, জাপান উত্তরাধিকার সূত্রে অতিত থেকে তা' লাভ করেছে। এক কথায় জাপান শতদল পদ্মের মত প্রাচীন পূর্ব্ব ভূখণ্ডের গভীরতার মধ্য থেকে সুকুমার সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয়ে, তারই গভীরতাকে এখনও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে।

এই প্রাচীন পূর্ব্ব-ভূখণ্ডের সন্তান জাপান তার পৈতৃক প্রাচীনতাকে অবলম্বন করে অভিভূত হয়ে পড়ে নি। সে বর্ত্তমান

যুগের কাছ থেকেও তার শ্রেষ্ঠ সম্পদের দাবী করছে। সে যেদিন তার অভ্যাসের বাঁধ ভেঙ্গেছে—সে যেদিন জড়চিত্তের নিরর্থক প্রথা-ঘটিত আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের মায়া কাটিয়ে বিচারের পথে বের হয়ে এসেছে, সেদিন আমরা তার অন্তরের নির্ভীকতার পরিচয় পেয়েছি। সে এই ভাবেই আজ জীবন্ত কালের সংস্পর্শে এসে বর্ত্তমান সভ্যতার দায়িত্বকে একান্ত ব্যাকুল উৎসাহের সহিত স্বীকার করে নিয়েছে।

এই ঘটনাই আজ সমস্ত পূর্ব্বমহাদেশকে প্রাণবান করে তুলেছে। আমরা বুঝেছি যে, আমাদের মধ্যে এখনও প্রাণ ও শক্তি আছে—শুধু বাহিরের মৃত আবরণটী সরালেই তা' প্রকাশ হয়ে উঠবে। আমরা এখন বেশ উপলব্ধি করেছি যে, মৃতের মধ্যে আশ্রয় নিলে, মৃত্যুকেই স্বীকার করা হয়। জীবনের সমস্ত দায়কে যতক্ষণ আমরা স্বীকার করি, ততক্ষণই আমরা সজীব থাকি।

জাপান যে পশ্চিমের অনুকরণ করে আজ তার বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে পেরেছে, একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমরা জীবনের অনুকরণ করতে পারি না—দীর্ঘকাল শক্তির ভাণ করাও সম্ভব নয়। অনুকরণ মাত্রেই দুর্ব্বলতার হেতু। কেননা এ আমাদের স্বভাবকে কেবলি প্রতিহত করে, এ আমাদের পথের বাধা। অপর লোকের চামড়া দিয়ে যদি আমাদের অস্থিপঞ্জরকে ঢাকা যায়, তাহলে যেমন সেই বাহিরের চামড়ার সঙ্গে দেহের অস্থিপুঞ্জের নিয়তই সংঘর্ষ হতে থাকে, এই অনুকরণ ব্যাপারটী ঠিক তেমনি।

আসল কথা এই যে, বিজ্ঞান মানুষের অন্তরঙ্গ নয়—ওটি জ্ঞান এবং শিক্ষা মাত্র। বস্তু জগতের নিয়মের জ্ঞান থেকে আমাদের অন্তরতর মনুষ্যত্বের আদৌ বিকাশ হয় না। অপরের কাছ থেকে জ্ঞান ধার

করা যায়—কিন্তু পরের স্বভাবকে আমরা কদাচই ধার করতে পারি না।

আমাদের শিক্ষায়, অনুকরণের একটা পর্য্যায় আছে। সেই অবস্থায় আমরা আসল থেকে বাজে জিনিসকে পৃথক করতে পারি নে। পাছে কিছু বাদ পড়ে যায়, এই ভয়ে আমরা তখন শস্যের সহিত খোসাকেও গলাধঃকরণ করি। লোভে পড়ে আমরা সবটা খাই বটে, কিন্তু আমাদের জীবনীশক্তি সব ত আত্মসাত করতে পারে না। সজীব পদার্থ নিজের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের মধ্যে কতক গ্রহণ এবং কতক বর্জ্জন করেই নিজের সজীবতা সপ্রমাণ এবং রক্ষা করে। সজীব পদার্থ নিজেকে খাদ্যের মধ্যে মগ্ন করে না, সে খাদ্যকেই নিজের মধ্যে নিজের রক্তমাংসে অস্থি মজ্জায় রূপান্তরিত করে নেয়। এই রূপেই সে সতেজ হয়ে উঠে। শুধু খাদ্যের সঞ্চয়ের দ্বারা নয়।

জাপান পশ্চিম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু জীবনী-শক্তিকে সে সেখান থেকে আনে নি। জাপান পশ্চিম থেকে বিজ্ঞানের যে সব উপকরণ আহরণ করে এনেছে, সে তার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে একটা ধারকরা যন্ত্রে পরিণত করতে পারবে না। তার একটা আত্মা আছে। সে তাকে তার সকল প্রয়োজনের উপরেই জয়ী করবে। তার যে এ ক্ষমতা আছে—এই পরিপাক ক্রিয়া যে ইতিমধ্যে চলেছে, তার সবল স্বাস্থ্যের লক্ষণ থেকেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক আশা এই যে, জাপান যেন কদাচ তার বাহিরের সঞ্চয়ের তরে নিজের আত্মাকে না হারিয়ে ফেলে। এইরূপ গর্ব্ব বস্তুতঃই হেয়। এই হীনতা মানুষকে দারিদ্র্য এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে নিয়ে যায়। পোষাকী বাবুরা

যেমন দেহের অপেক্ষা দেহের আবরণ নিয়ে অধিক গর্ব্ববোধ করে, এও ঠিক তাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার হাত থেকে জাপান যে সুবিধা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে সে কি করবে তাই দেখবার জন্য সমস্ত জগত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যদি তা' পশ্চিমের অনুকরণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তবে তার সম্বন্ধে বিশ্বমানব যে আশা করে আছে, তা' ব্যর্থ হবে। পশ্চিম, বিশ্বের সম্মুখে অনেক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত করেছে—কিন্তু তাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে নি। ব্যক্তির সহিত সমাজের, ধনীর সহিত শ্রমিকের, পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সংঘর্ষ সেখানে দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে। সেখানে ঐহিক সুখ-লালসার সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের, জাতিগত স্বার্থপরতার সহিত মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শের, রাজ্য বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার কদর্য্য জটিলতার সহিত মানুষের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সরলতা, সুষমা এবং অবকাশ-প্রবণতার যে বিরোধ বেধেছে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই এখন বিশ্বের পক্ষে সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। সবাই জাপানের কাছ থেকে এই সমস্যার মীমাংসা প্রত্যাশা করছে।

এই পশ্চিমের সভ্যতার অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভারে আজ যে তার নিজেরই শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে, তার লক্ষণ যেখানে সেখানে ফুটে উঠছে। এ মুখে মানবপ্রেমের যতই আস্ফালন করুক, এ যে আজ মানুষের পক্ষে ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। ইতিহাসের আরম্ভে বর্ব্বরদের অত্যাচারে মানুষ যে ভাবে পীড়িত হত, এর অত্যাচার তার চেয়েও শতগুণে পীড়াদায়ক একথা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। এ স্বাধীনতা প্রিয় বলে

মুখে বড়াই করে বটে, কিন্তু এ যেরূপ দাসত্বের বিস্তার করছে, তার কাছে অতীত যুগের কৃতদাস-প্রথাও লজ্জায় নত হয়ে যায়। এর এই ভয়ানক হীনতার মোহে মানুষ যে দিন দিন মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে—যে সব মহৎ গুণ মানুষকে বড় করে, তারা যে দিন দিন তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে, সে কথার উল্লেখ মাত্রই বাহুল্য।

অতএব এই পশ্চিমের সভ্যতাকে নির্ব্বিচারে একেবারে লঘুভাবে গ্রহণ করা কোনও মতেই শ্রেয় হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য, এর উপায় এবং এর উপকরণকে আজ যদি আমরা অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে বস্তুতঃই সাংঘাতিক ভুল করা হবে। এর মধ্যে আমাদের পূর্ব্বদেশের চিত্তকে, আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে, আমাদের সরলতার আদর্শকে প্রয়োগ করতে হবে—সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যে বিচিত্র দায় আছে, তাদের স্বীকার করে নিয়েই এই সভ্যতার তরে আমাদের নূতন পথের আবিষ্কার করে নিতে হবে। এ প্রতি পদে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতা এবং প্রাণ হরণ করে চলেছে, আমাদের এর সেই নির্ম্মমতাকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা যে আমাদের নিজের ভাবে চিন্তা করে—উপলব্ধি করে—কর্ম্ম করে এসেছি, তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত আজই পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এ আমাদের রক্তের সঙ্গে, আমাদের অস্থিমজ্জায়, আমাদের মাংসে, আমাদের মস্তিষ্কে নিহিত হয়ে আছে। সুতরাং আমরা যাতেই হাত দেব, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের এই সাধনার ফল আমাদের অজ্ঞাতসারে এমন কি আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলেও তার উপর প্রভাব বিস্তার করবেই করবে। একদা জাপান তুমি মানবের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান

করেছিলে। তোমার দর্শন ছিল—তোমার জীবনযাত্রার নিজস্ব প্রণালী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাকে তোমার সেই সব সাধনা প্রয়োগ করতে হবে। তা' থেকে যে অভিনব সভ্যতার সৃষ্টি হবে, তা পশ্চিমের অনুকরণ মাত্র হবে না। সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি তোমার আত্মাকেই অভিব্যক্ত করে তুলবে—বিশ্ব মানবের কল্যাণ যজ্ঞে তোমার সেই দান তোমার আত্মাকেই ধন্য করে তুলবে। এসিয়ার মধ্যে তোমরাই এখনও স্বাধীন আছ। পশ্চিম থেকে তোমরা যে সব উপাদান সংগ্রহ করেছ একমাত্র তোমরাই নিজেদের প্রতিভা এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব তোমাদের দায়িত্বও সবার চেয়ে বেশী। মানব সভায় পশ্চিম যে সমস্যা উপস্থিত করেছে এসিয়া তোমারই কণ্ঠে তার উত্তর দিবে। যন্ত্রের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে স্বার্থপরতার জায়গায় মনুষ্যত্বকে বসিয়ে বর্ত্তমান সভ্যতাকে সংস্কার করে তুলবার ভার ভগবান এই পূর্ব্বদেশের উপর ন্যস্ত করেছেন। তোমাদেরই দেশে ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এখন ক্ষমতা এবং সফলতার প্রলোভনে উন্মাদ হওয়া তোমাদের পক্ষে একেবারেই অশোভন অবং অন্যায় হবে। এখন তোমাদের সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনাতেই নামতে হবে।

সখ্যের বন্ধনই ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে সত্যকার বন্ধন। যে দিন ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান পর্য্যন্ত এই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল সেই অতীতের কথা আজ আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। তখন আমাদের মধ্যে একটা সজীব হৃদয়ের যোগ ছিল—সেই যোগসূত্রে তখন আমাদের মধ্যে

মনুষ্যত্বের গূঢ়তম প্রয়োজনের বাণীর আদান প্রদান হ'ত। তখন আমরা পরস্পরকে ভয়ের চক্ষে দেখতাম না—পরস্পরকে বিধ্বস্ত করবার তরে তখন আমাদের এত অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন করতে হ'ত না। আমাদের মধ্যে তখন যে সম্বন্ধ ছিল, তার সহিত স্বার্থের কোনও সম্পর্কই ছিল না। তখন আমরা অবাধে ভাব ও আদর্শের আদান প্রদান করতাম। তখন আমরা প্রেমের দ্বারাই পরস্পরকে পেয়েছিলাম। ভাষা অথবা প্রথার পার্থক্য আমাদের সেই মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। জাতি-গর্ব্ব কিম্বা ধন ও বলের গর্ব্ব আমাদের সেই প্রেমের সম্পর্ককে কলুষিত করতে পারেনি। এই সম্মিলিত হৃদয়ের অরুণ কিরণের প্রভাবে আমাদের সাহিত্য ও আমাদের শিল্পকলা নব নব পত্র পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন ইতিহাসের মানুষ, প্রেমের প্রভাবে সকল বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে নিজেদের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। যখন মানুষ পরমার্থের তরে এমন উদারভাবে মিলিত হচ্ছিল—সেই শান্তি ও প্রেমের যুগে তোমাদের মধ্যে যে অমৃত সঞ্চিত হয়ে এসেছে, আজ যে তোমরা তারই প্রভাবে এই নবযুগের মধ্যেও নিজেদের প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারবে এমন আশা হয়। আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তর এসেছে, সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি এমন যুগান্তর কখনও ঘটে নাই। তোমাদের সেই পিতামহদের অমৃতের সঞ্চয় আজ তোমাদের এই বিপ্লবের হাত থেকে কি রক্ষা করবে?

যে রাজনৈতিক সভ্যতা ইউরোপের মাটি থেকে উত্থিত হয়ে আজ সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, বর্জ্জন ও সংহারই তার

ভিত্তি। সে সকলকেই দূরে রাখতে অথবা নির্ম্মূল করবার তরে সজাগ হয়ে আছে। এ যে শুধু মাংসাশী, তা' নয়—এ নর-মাংসাশী। এ পরস্বাপহরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না—এ যেন বিশ্বের সমস্ত ভবিষ্যতকে আত্মসাৎ করতে চলেছে। অন্য জাতের একটু উন্নতি দেখলেই এ ভীত হয়ে পড়ে। নিজের সীমার বাহিরে একটু শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই তাকে বিপদ ভেবে এ ব্যাকুল হয়ে উঠে। যারা দুর্ব্বল তাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে চিরদিনের তরে বদ্ধ করে রাখতে, এ আদৌ দ্বিধা অনুভব করে না। এই সভ্যতা যখন ক্ষমতা লাভ করেনি—তার পূর্ব্বে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, তার ফলে মানুষে অনেক রকম দুঃখের ভাগী হয়েছে। কিন্তু এমন বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসী দৃশ্য পৃথিবীতে এর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নি। এমন, জাতকে জাত বিলুপ্ত করবার চেষ্টা এর পূর্ব্বে কখনও কেউ দেখেনি। আজ যেন একটা প্রকাণ্ড হিংসা সমস্ত পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করবার তরে তার জঘন্য নখ দন্তকে বিস্তার করেছে। এই রাজনৈতিক সভ্যতা বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে, কিন্তু এতে মনুষ্যত্ব নেই। ধনী যেমন আত্মাকে খর্ব্ব করে ধন সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে ক্রমান্বয়ে ধনশালী হয়ে উঠে, এও তেমনি এর সমস্ত শক্তিকে একই উদ্দেশ্যে সংহত করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এ স্বার্থের তরে অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ স্বার্থসিদ্ধির তরে মিথ্যার জাল বুনতে আদৌ লজ্জা বোধ করে না। এ লোভকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেশভক্তির অঞ্জলি দিয়ে তাকে পূজা করে। যাই হৌক, এটা নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপার বরাবর চলতেই পারে না। কেননা, পৃথিবীতে ন্যায় বলে একটা জিনিস আছে, সে কখনই

এই ব্যভিচারকে চিরদিন রেয়াৎ করবে না। ব্যক্তিভাবে আমরা যে ন্যায়ের শাসনের সুবিধা ভোগ করে চলেছি, জাতের নামে সেই ন্যায়কে লঙ্ঘন করা বেশীদিন সম্ভব হবে না। এই রাজনৈতিক সভ্যতার আয়ু যে দীর্ঘ নয়, একথা নিশ্চয় জানবেন। গ্রীসের প্রদীপ আজ নির্ব্বাপিত—রোমের শক্তি আজ তার সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সমাহিত। কিন্তু সেই সভ্যতা সমাজ এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ যার ভিত্তি, তা' আজও চীন এবং ভারতের মধ্যে সজীব হয়ে আছে। এই কলিযুগের কলগত শক্তির আদর্শে একে বিচার করলে, একে হয়ত আপাততঃ দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হতে পারে; কিন্তু এ বীজের মত; ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে এখনও জীবনের সম্ভাবনা নিহিত হয়ে আছে—একদিন এ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়বে; কিন্তু শক্তি এবং লোভের ভগ্নাবশেষকে ঈশ্বরের প্রসাদ ধারাও সজীব করে তুলতে পারবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কখনই জীবন ছিলনা - তারা বিশ্ব-ভুবনের বিরোধরূপেই অবতীর্ণ হয়েছিল। যে সব জাত ক্ষমতার মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চিরন্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে, তারা তাদেরই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

পূর্ব্বদেশের আদর্শ স্থিতিশীল—তাদের মধ্যে গতির তত্ত্ব নাই এমনি একটা অপবাদ সচরাচর শুনা যায়। এর কারণ আমাদের জ্ঞান যখন অস্পষ্ট থাকে, তখন আমাদের সেই জ্ঞানের বিষয়কে আমরা অস্পষ্ট বলে গাল দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কালার সামনে হারমোনিয়াম্ বাজালে সে যেমন আঙুলেরই নড়াচড়াটেকেই হারমোনিয়াম্ বাজনার উদ্দেশ্য বলে ভুল করে, পাশ্চাত্য দেশের

অধিবাসিরাও আমাদের সভ্যতাকে কেবলি নিরবচ্ছিন্ন দার্শনিকতা বলে উড়িয়ে দেয়। আমাদের সভ্যতা যে একটা গভীর সত্যের উপর স্থাপিত, এ তারা মনেই করে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যকে উপলব্ধি না করলে, তাকে অপর উপায়ে সপ্রমাণ করা যায় না। আমার সামনে যে দৃশ্যটী আছে, তাকে যদি আমি না দেখি, তাহলে তাকে আমার দৃষ্টির মধ্যে সত্য করে তোলা কোনও মতেই সম্ভব হতে পারে না। তেমনি আমাদের সভ্যতা যে ভুয়ো নয়—তাতে যে এমন একটা সত্য আছে, যাতে মানুষ আশ্রয় লাভ করতে পারে, যার বিশ্বাস নাই তাকে একথা বোঝান অসম্ভব।

যারা বলেন আমরা আদৌ অগ্রসর হচ্ছি না—আমাদের মধ্যে একেবারে গতির তত্ত্ব নাই, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি—তাদের এ ধারণার কারণ কি? লক্ষ্যের আদর্শে গতি নির্ণয় করতে হয়। রেলগাড়ী তার গন্তব্য ষ্টেসন অভিমুখে অগ্রসর হয়, ইহাই গতি। কিন্তু গাছের এ রকম গতি নাই—তাহলেও গাছ স্তরে স্তরে, গোপনে গোপনে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। সে সূর্য্যের আলোক থেকে উত্তাপ এবং মাটি থেকে রস আহরণ করে এমনি বেঁচে চলে।

আমরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে চলেছি। এখনও আমরা বেঁচে আছি। আমরা যা চাই, তার শেষ নাই—তা' মৃত্যুকেও অতিক্রম করে পাই। আমাদের এই অন্তরের ধনটী প্রাণে ভরা—তাই জীবনের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করে মৃত্যুর মধ্যেও এ অমরতা লাভ করে। যখন বর্ত্তমান সভ্যতা ক্লান্ত হয়ে ধূলি সমাচ্ছন্ন বেশে ঘরে ফিরবে, যখন এর ধনের সঞ্চয় ফতুর হয়ে যাবে, এর দর্প যখন

চূর্ণ হবে, যখন মানুষের অন্তরাত্মা সংসারের ঘটনার মধ্যে সত্যকে পাবার তরে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কর্‌বার তরে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তখন নিশ্চয়ই এর দরকার হবে। এর সার্থকতা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার মধ্যে—বস্তুর সঞ্চয়ের মধ্যে নয়।

অনেক সময় অপেক্ষা কর্‌লে ঠক্‌তে হয়। যদি হাটের মধ্যে সব চেয়ে সুবিধার জায়গাটী অধিকার কর্‌তে হয়, তাহলে দীর্ঘশ্বাসে সবার আগে ছুটতে হয়। পাছে চঞ্চল সুবিধাগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়, এর তরে সদাই জাগ্রত থাকতে হয়। কিন্তু জীবনের আদর্শ ঠিক এর বিপরীত। সে আমাদের সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলে না। সে ধীরে ধীরে বীজ থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে এবং গাছ থেকে ফুলে ফলে পরিণত হয়ে চলে। অনেকদিন ধরে সে যেমন গড়ে উঠে, তেমনি সে অক্লেশে অনেক দিনের অবজ্ঞার মধ্যেও আত্মরক্ষা করে চলে। পশ্চিম, সুবিধার পিছু পিছু ছুটে ছুটে যতদিন না বেদম ও বিফল হয়ে পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য-সভ্যতা অনায়াসেই তার অতীতের সঞ্চিত তপস্যার প্রভাবে ধৈর্য্য ধরে থাকবে। পশ্চিম এখন রেলগাড়ী করে তার কাজ বজায় কর্‌তে চলেছে—আমরা পথের পাশে ধান কাটছি, চলার নেশায় উন্মাদ পশ্চিম আমাদের দেখে গতি-হীন বলে উপহাস কর্‌তে পারে। কিন্তু তার এই চলা একদিন শেষ হয়ে যাবে, তার কাজও কালক্রমে ফুরিয়ে যাবে, তখন তার ক্ষুধিত অন্তর যখন খাদ্যের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, সে তখন নিশ্চয়ই আমাদের কাছে নেমে আসবে। অফিসের কাজ থামতে পারেনা, কেনা বেচারও বিরাম হতে পারেনা; কিন্তু প্রেমের ধৈর্য্য অপার। শুভ লগ্ন না আসা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশ সেই প্রেমের জোরেই অপেক্ষা করে থাকবে।

পশ্চিম যেখানে মহৎ সেখানে তাকে মহৎ বলে স্বীকার কর্‌তেই হবে। তার এমন অনেক গুণ আছে, যাদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। পশ্চিমকে আমি আমার অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। ইউরোপ যখন তার সাহিত্য ও শিল্পকলার যোগে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালের মধ্যে সত্য ও সুন্দরকে প্রসারিত করে দেয়—যখন সে তার বিপুল মানসিক শক্তিকে মানুষের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করে, যখন পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে তখন তার কাছে মাথা স্বতঃই নেমে আসে। এই সব কাজ আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন হতেই পারে না। মানুষের আত্মাই বাধাকে অতিক্রম কর্‌তে পারে। আত্মার চরম সার্থকতার উপর বিশ্বাস আছে বলেই সে বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রা করে—যে উদ্দেশ্য সমস্ত জীবনেও সম্পন্ন হবার নয়, সে এই বিশ্বাসের প্রভাবেই তার তরে হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করে নেয়। সে বারবার ব্যর্থ হলেও হার মানে না। ইউরোপ যে অন্তরে অন্তরে মানুষকে ভালবাসে, তার যে ন্যায়ের প্রতি একটী শ্রদ্ধা আছে, সে যে উচ্চ আদর্শের তরে দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত নয়, এর লক্ষণ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম আজ বহু শতাব্দী ধরে তার অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। ইউরোপের মধ্যে আমরা এমন অনেক মহাত্মার পরিচয় পেয়েছি, যারা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষের অধিকারকে পরাধীনতা থেকে উদ্ধার কর্‌বার তরে প্রাণপণ করেছেন। যারা মনুষ্যত্বের তরে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, যারা নিজের জাতের অনাচারকে অনাচার বলে ঘোষণা করে দেশবাসীর অপ্রিয়তাকে বরণ করেছেন। এই সব সত্যনিষ্ঠ মহাত্মারা ন্যায়কে এবং সত্যকে জয়ী

করবার তরে ভৌগলিক বাধা আদৌ মানেন না। আজও যে ইউরোপে জীবনের উৎস নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এরাই তার প্রমাণ। তাদের দ্বারায় ইউরোপ যুগে যুগে নব নব জন্ম লাভ করবে। ইউরোপ যেখানে ক্ষমতা প্রসারে ব্যস্ত, সেইখানেই সে তার অন্তরাত্মাকে উপেক্ষা করে নিজের পাপকে কেবলি পুঞ্জিত করছে। একদিন ঈশ্বরের রুদ্র রোষ এই পাপের শোধ নেবেই—ইউরোপ যে আজ তার বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের তরে, কদর্য্য লোভের জালে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, এ কখনই চিরদিন সইবে না। ইউরোপ যখনই মনুষ্যত্বের দিকে ফিরেছে, তখনই তার মুখ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং যখনই সে নিজের স্বার্থের দিকে ফিরে মানুষের অন্তর-নিহিত অনন্ত ও নিত্য পুরুষকে আঘাত করেছে, তখনই সে কলঙ্কে ম্লান হয়ে গেছে।

পূর্ব্ব এসিয়া তার নিজের পথেই চলে আসছে। সে যে সভ্যতাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছে, রাজনীতি তার ভিত্তি নয়—সমাজ-নীতিই তার প্রতিষ্ঠা ভূমি। এই কলিযুগের কলের সভ্যতার মত আমাদের এই সভ্যতা কার্য্যকরী না হলেও, তা' আধ্যাত্মিক এবং তা' মনুষ্যত্বের বিচিত্রতর ও গভীরতর সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরিবিলিতে সমাজ-সমস্যার মীমাংসা করে এতদিন নির্জ্জনে তাকে চালিয়ে আসছিলাম। রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তনে তার ইতর-বিশেষ হয় নি। কিন্তু এখন বাহিরের জগত আমাদের উপর এসে পড়েছে—আমাদের নির্জ্জনতাও ভেঙ্গে গেছে। তাহলেও এর তরে যেন আমরা ক্ষুব্ধ না হই। বীজ যখন তার আবরণ ভেদ করে ওঠে, তখন কি ক্ষোভ করবার সময়? বিশ্বের সমস্যাকে এখন

আমাদের সমস্যা করতে হবে—আমাদের সভ্যতাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সভ্যতার মধ্যে প্রসারিত করে দিতে হবে—তাদের মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাতে সামঞ্জস্য আনতে হবে। এখন আর আমাদের কুণো হয়ে থাকলে চলবে না। আমরা এতদিন আত্মরক্ষার তরে যে আবরণ রচনা করেছিলাম আজ তাকে ভাঙ্গতেই হবে।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানই প্রথম এই বাধামোচনের কাজে ব্রতী হয়েছে। তার সফলতা আজ আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। সৃষ্টির কাজ মাত্রেই এই আশার ইন্ধনের দরকার আছে। এসিয়াকে যে সজীব কিছু সৃষ্টি করতে হবে তার যে অবসাদের মধ্যে পড়ে থাকলে চলবে না—ভয়ে অথবা লোভে পড়ে পশ্চিমের অনুকরণ করলে, তাকে যে শুধু ব্যর্থ হতে হবে, একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে। এইটুকুর তরে আজ আমারা জাপানকে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। বিশ্বযজ্ঞে প্রাচ্য যা কিছু দেয় সে যে জাপানের দিয়েই তা' দিতে আরম্ভ করেছে, এই কথাটী জাপানকে স্মরণ রাখতেই হবে। আজ তাকে তার আদর্শটীকে সবার উচ্চে ধরে রাখতে হবে। স্বার্থের আবর্জ্জনায় তা যেন আচ্ছন্ন না হয়। সে যেন চিরকাল মুক্ত থেকে প্রভাতের আলোকে এবং রাত্রের অন্ধকারে বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করে ধন্য হয়।

শ্রীঅমূল্য রতন প্রামাণিক।

পঁচিশে বৈশাখ।

—:০:—

রাত্রি হ'ল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে করে' আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক্
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্ম্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয় তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
জন্ম মরণের
দিগ্বলয় চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে'।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয় দিক্‌প্রান্ত তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল ছন্দে,
শ্যামলের বুকে
নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেচি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।
হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে

প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক্ তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন!
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন!
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
'শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মত, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন!
ব্যক্ত হোক্ জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়!"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

যুদ্ধের কথা।

(প্রশ্ন)

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সুহৃদবরেষু—

—"পৃথিবীতে এমন দিন কি কখনো আস্‌বে মশায় যখন আর যুদ্ধ থাকবে না" ?

—"আমার ভবিষ্যদৃষ্টি নেই, তাই এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌তে আমি অপারগ"।

—"কিন্তু আপনি কি মনে করেন্" ?

—"আমি আশা করি যে যুদ্ধ একদিন বাতিল হয়ে যাবে"।

—"কিছুতেই যাবে না। এ পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন যুদ্ধ চলবে"।

—"আমি আগেই বলেছি আমার ভবিষ্যদৃষ্টি নেই, অতএব যার আছে, তার কথার আমি প্রতিবাদ কর্‌তে পারিনে"।

—"ঠাট্টা করবেন না মশায়। আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক। যুদ্ধ করা হচ্ছে human nature, ভবিষ্যতে আর যারই বদল হোক, মানুষের nature ত আর বদলাবে না"।

আজ থেকে ছ-বছর আগে জনৈক যুবকের সঙ্গে আমার উক্ত বচসা হয়। তাঁর শেষ কথার পর আমি যে নিরুত্তর হয়ে গেলুম,

তার কারণ nature-এর নাম শোনবামাত্রই আমি ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তখন আর আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। জানি আর যার সঙ্গেই হোক্ nature-এর সঙ্গে রসিকতা চলে না।

এর পর বহু লোকের মুখে ঐ একই কথা শুনেছি; এমন কি, বৃদ্ধের মুখে, বণিতার মুখে, রোগীরও মুখে, ভোগীরও মুখে। ইউরোপে যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধের আলোচনাও এদেশে কিছুদিন থেমে ছিল। তারপর non-violent non-co-operation-এর আন্দোলনের পিঠ পিঠ এ আলোচনা নবজীবন লাভ করলে। ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়াতে গিয়ে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় বললেন যে, তাদের এখন mobilise কর্‌তে হবে। তারপর দেখা গেল যে, সামরিক-পরিভাষা ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কথাই কইতে পারেন না। Volunteer enlistment, recruitment camouflage, discipline, obedience, dictator, sacrifice, suffering, প্রভৃতি পদ যে সামরিক অভিধানের, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথা, তা অবশ্য সকলেই জানেন। এমন কি কেউ কেউ স্ত্রীহস্ত-প্রসূত অতি সূক্ষ্ম পদার্থকেও যুদ্ধের উপকরণ করে তোলবার চেষ্টায় ছিলেন। একটি উদাহরণ দিই।

আমার জনৈক অতি শান্ত শিষ্ট সুপণ্ডিত বন্ধু আমাকে চরকা ঘোরাতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য তিনি নিজে ওকাজে কখনো হাত লাগান নি। উত্তরে আমি বলি যে, "কথার টিপ্পনী কাটা যার ব্যবসা, তাকে তুলোর সূতা কাট্‌তে বলাটা কি কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়া নয়" ? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যে—"যুদ্ধের সময় সকলকেই সব কাজ ফেলে, যুদ্ধের কাজেই হাত

লাগাতে হয়। ফরাসী দেশে যুদ্ধ সুরু হতেই সে দেশের সব স্যাকরা রাতারাতি কামার হয়ে গেছে"। আমি বল্লুম যে, "একথা যদি সত্যও হয় যে, যারা সোণার নথ বানাত, তারা আজ লোহার কামান বানাচ্ছে, যারা নোলক তৈরি করত—তারা গুলি তৈরি কর্‌ছে, আর যাদের হাত থেকে চুলের কাঁটা বেরত—তাদের হাত থেকে আজ বন্দুকের সঙ্গীন বেরচ্ছে; তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা, স্ত্রীলোকের ভূষণ যে আয়ুধ—একথা সংস্কৃত কবিরা বলে গেছেন। যারা এক ধাতুর অস্ত্র বানাত, তারা আর এক ধাতুর অস্ত্র বানাচ্ছে, এই যা তফাৎ। ও analogy এখানে খাটে না—বস্ত্র যে অস্ত্র, এমন কথা কখনো শুনিনি, বরং দেখেছি যে, মল্লযুদ্ধ করতে হলে পালোয়ানরা বিবস্ত্র হয়। এর পর তিনি হাসলেন, আমি হাসলুম; ফলে কথাটা তর্কযুদ্ধে পরিণত হল না।

(২)

এ সব কথার উল্লেখ করলুম এই প্রমাণ করবার জন্য যে, অধিকাংশ লোকের যুদ্ধের প্রতি হয় মোহ নয় মায়া, হয় প্রীতি নয় ভক্তি, এক কথায় একটা মনের টান আছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মনের টানটা কি মানুষের প্রাণের টান—অর্থাৎ এই প্রবৃত্তি অথবা প্রীতির মূল কি human nature? এ প্রশ্ন করবার উদ্দেশ্য অবশ্য আপনি বুঝতে পারছেন। Nature বলতে আমরা বুঝি বাইরের এমন সব বাঁধাধরা নিয়ম, যা অমান্য করা মানুষের সাধ্যের অতীত, অর্থাৎ যা মানুষের পুরুষকারের অধীন নয়। এখন আমি জানতে চাই যে, human nature বলে এমন কোনও

জিনিস আছে কিনা, যা আমরা প্রত্যেকেই আবহমান কাল আমাদের অদৃষ্ট বলে মেনে নিতে বাধ্য? তারপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি কি উক্ত nature-এর একটি অঙ্গ না উক্ত natureয়ে তা প্রক্ষিপ্ত?

মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, একের nature, আর একের nature নয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ না থাকতে পারে, কিন্তু জীবাত্মায় জীবাত্মায় প্রভেদ বিস্তর। তারপর ছেরেফ "অহং"-এর নিকে নজর দিলেও দেখতে পাই যে, নিজের ভিতরও বহুবিধ পরস্পর বিরোধী nature আছে। যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁর কাছেই এ সত্য প্রত্যক্ষ যে, মানুষের অন্তরটা হচ্ছে পশু ও দেবতার একটা গুপ্ত রণক্ষেত্র এবং সে ক্ষেত্রে কখনো পশু কখনো দেবতা জয়লাভ করে। সুতরাং মানুষের কাছ থেকে human nature-এর সন্ধান পাওয়া যাবে না। কাজেই সব মানুষের ভিতর ঐক্য বার করতে হলে ধরে নিতে হবে যে, মানুষ মূলত হয় পশু নয় দেবতা; সংক্ষেপে human nature-এর মূলতত্ত্বের সন্ধান নিতে হবে inhuman nature-এর কাছে অর্থাৎ হয় তার sub-human nature-এর নয় তার super human nature-এর কাছে।

শুনতে পাই মানুষে এ দু-দিকেই যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু তার ফলে তারা স্বর্গ থেকে কি সার সত্য পেড়ে নামিয়েছে আর পাতাল থেকেই বা কি গভীর তত্ত্ব খুঁড়ে তুলেছে, তা আমার অবিদিত। লোকে বলে মানুষের আদিম পশুত্বের পুরো খবর জানবার জন্য ইউরোপীয় নূতন বিজ্ঞানের পারদর্শী হওয়া দরকার আর তার আদিম দেবত্বের পুরো খবর জানবার জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন

দর্শনের পারগামী হওয়া দরকার। এ বিজ্ঞান আর ও দর্শনের আমি মুখ চিনি; কিন্তু এ দুয়ের কারও সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই এবং সে পরিচয় নেবার আমার প্রবৃত্তি থকেলেও শক্তি নেই। তাই আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।

(৩)

Inhuman natureয়ে সশ্রদ্ধ হবার পক্ষে আমার কোথায় বাধে, তা উপরে ইঙ্গিতে জানিয়েছি। এখন একটু মন খুলে আপনার কাছে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দেই। তা না দিলে আপনি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারবেন না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এ সন্দেহ দূর করবার জন্য আমি এত ব্যস্ত কেন? ব্যস্ত এইজন্য যে, মানব-প্রকৃতি বস্তুটা যে কি, তা জানবার কৌতূহল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; নইলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে আমার ঘুম হয় না তা নয়। ভাষায় বলে চোখ বুঁজলেই অন্ধকার। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে প্রতি লোকের ভবিষ্যতের মেয়াদ, তার মরণ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানেরই সামিল। আর দেহ-খাঁচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাখী সত্যিই উড়ে যায়, তাহলেও সে ইহলোকে থাকবে না, পরলোকে চলে যাবে; তখন সেই পরলোকের এবং সম্ভবত পৃথিবীর চাইতে বড়লোকের বড় পলিটিক্‌স নিয়ে সে আত্মাকে এত বিব্রত থাক্‌তে হবে যে, তুচ্ছ মর্ত্তলোকের গাঁপড়ের লড়াই হয় কি না হয়, সে ভাবনা ভাববার তার আর অবসর থাকবে না। এ ছাড়া আর একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা আছে। মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি

একদিন থেমে যাবে—এই আশা করার দরুণ; লোকে বলে আমি sentimental। কথাটা খুব সম্ভবত সত্য। মানুষ দেখে দেখে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে, যার শরীরে emotion-এর লেশমাত্র নেই, সেই লোকই হয় ঘোর sentimental। এক কথায় sentimentality হচ্ছে emotion-এর ভেঙচামি। আমার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁদের দিব্যদৃষ্টির X rays দিয়ে দেখেছেন যে, আমার মাথার ভিতর হৃদয় নেই, সেখানে আছে শুধু মস্তিষ্ক, অতএব sentimental হওয়ার বিপদ আমার আছে। তবে আমি যে, সমাজে জাল emotion-এর ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছি, একথা মনে করতে ভাল লাগে না। এই জন্যই human natureটা যে কি, তা জানতে চাই।

(৪)

মানুষের ভিতর যে পশু আছে, তা মানুষ আদিকাল থেকেই জানে—কিন্তু শরীরের কোন ছিদ্র দিয়ে সেপশু যে তার অন্তরে প্রবেশ করলে, তা সে পূর্ব্বে ভেবে ঠাওর করতে পারেনি। তারপর ডারউনিনের Descent of Man প্রকাশ হবার পর এ সত্য আর মানুষের কাছে চাপা থাকল না যে, মানুষ পশুর বংশধর। আর উত্তরাধিকারী সত্ত্বে সে তার পৈতৃক পশুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং মানবধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে পশুধর্ম্মের কাছে—অর্থাৎ human nature হচ্ছে sub-human nature। তার পর পশুধর্ম্ম যে কি, তাও ডারউইন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। Struggle for existence হচ্ছে ও ধর্ম্মের আদি ও অন্তসূত্র। ও সূত্রের বাঙলা

হচ্ছে—"বড় মাছ ছোট মাছটাকে খায়", আর সংস্কৃত হচ্ছে—"মৎস্য ন্যায়"। সুতরাং উক্ত মৎস্য ন্যায়ের বশবর্ত্তী হয়েই পশু যখন মানুষ হয়েছে, তখন একই পদ্ধতি অনুকরণ করে আমরাও দেবতা হব, survival of the fittest-এর বিধি অনুসারে। বড় মাছটা ছোট মাছটাকে না খেয়ে, ছোট মাছটা যদি বড় মাছটাকে খেত, তাহলে পৃথিবীতে যা কিছু বড় সব মারা যেত, আর যা কিছু ছোট—সব টিঁকে থাকত। তাহলে সৃষ্টির উল্টো উৎপত্তি হত, আর তখন এ বিশ্বকে ভগবানের বিশ্ব বলে কিছুতেই মানা চলত না। অতএব মানুষের মনে যতদিন বড় জিনিষের প্রতি ভক্তি আছে; ততদিন মানুষের মধ্যেও যে বড়, সে ছোটকে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বলতে বাধ্য "যুদ্ধং দেহি"।

এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে, পশু-জগতে সকলেই ত আর আমিষাশী নয়, বহু পশু নিরামিষাশী। মানুষ যাদের নিয়ে ঘর করে, তারা ত প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, যথা—গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি। ষাঁড়ে ষাঁড়ে অবশ্য লড়াই করে; কিন্তু সে মাসের জন্যও নয়, ঘাসের জন্যও নয়। আর মেড়াকে লড়াই করতে শিখিয়েছে মানুষ। সে লড়াইয়ে মেড়া বেচারার কোনরূপ স্বার্থ নেই—আর সে লড়াইয়ে তার যে প্রবৃত্তিও নেই; তার প্রমাণ মেড়ার প্রথমে কাণে ফুঁ না দিলে, তারপর তার কাণ না মলে দিলে, সে লড়াই করে না। সুতরাং বাঁচবার জন্য জীবমাত্রেই যে যুদ্ধ করে, একথা সত্য নয়। তারপর আমিষভোজী পশুরাও যুদ্ধ করে না, কিন্তু জীবহত্যা করে শুধু তার মাংস খাবার জন্যে। বাঘে বকরিতে যুদ্ধের কথা কেউ কখনো শুনেছে? সুতরাং ও নজিরও মানুষের পক্ষে

খাটে না। জর্ম্মাণরা যদি ফরাসীদের আহার কররার জন্য বধ করত, তাহলে তাতে কারও কোন আপত্তি থাকত না। কেননা তাতে অনর্থক এত নরহত্যা হত না। শুনতে পাই যে, একজন জর্ম্মাণ দশজন ফরাসীকে মারতে পারে—কিন্তু দশজন জর্ম্মাণ একজন ফরাসীকে খেতে পারে না। অভক্ষ্যকে বধ করা পশুর ধর্ম্ম নয়, মানুষের ধর্ম্ম। দল বেঁধে লড়াই অর্থাৎ যুদ্ধ পশুতে করে না, অন্তত শাক্ত পশুরা ত নয়ই—অতএব sub-human natureয়ে যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। দলবেঁধে লড়াই পাঁপড়েকে করতে দেখেছি আর মৌমাছিরা করে শুনেছি। কিন্তু মানুষ যে পোকা মাকড়ের বংশধর—এমন দুর্ব্বাক্য ডারউইনও বলেন নি। আর আমরা যুদ্ধ করি বলেই যদি ধরে নিতে হয় যে, আমরা মৌমাছি, পাঁপড়ের প্রপৌত্র, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, আমরা মাকড়সারও অধস্তন পুরুষ—কেননা, আমরা সুতো কাটি। পোকা মাকড়ের পৃষ্ঠ দন্ত নেই, আমাদের আছে, অতএব আমরা একজাত নই। ডারউইনের কথা আমি মানি কিন্তু অন্য অর্থে। Struggle for existence-এর মানে আমি বুঝি struggle against death আর যুদ্ধের মানে হচ্ছে struggle for death সুতরাং আমার মতে যুদ্ধ হচ্ছে ডারউইনের কথার প্রতিবাদ।

আমার মত অবশ্য ভুল, কেননা আমার একটি বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেছেন যে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তির নামই যে human nature, তা বুঝতে হলে বক্ষ্যমান বিজ্ঞানগুলি জানা চাই। (১) Cosmology, (২) Geology, (৩) Metereology, (৪) Biology, (৫) Zoology, (৬) Geneology, (৭) Anthropology, (৮) Histo-

logy, (৯) Physilogy, (১০) Ethnology, (১১) Sociology, (১২) Psychology, (১৩) Sexology, (১৪) Pathology—

এই চৌদ্দ শাস্ত্রের দশটির আমি নাম শুনেছি, কিন্তু কখনো তাদের চোখে দেখি নি। আর বাকী চারটির বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমার বিদ্যের দৌড়। তাই Sentimentalityর অপবাদ হতে মুক্ত হবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। বিজ্ঞানের ঐ চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ করে—আপনি যদি বলেন যে, human nature হচ্ছে sub-human nature আর sub-human nature একদম মারাত্মক, তাহলে কালই আমি non violence-এর দলে নাম লেখাব।

(৫)

যতদিন তা না হয়, ততদিন আমার মনে এ ধারণা থেকে যাবে যে, ঐতিহাসিক যুগের মানুষের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড sentimentality আছে; বিশেষত বই পড়া মানুষের মনে। এর কারণও স্পষ্ট। মানুষের যত মহাকাব্য, সব যুদ্ধের কাব্য। ইলিয়াড, মহাভারত, রামায়ণ, মেঘনাথ বধ, বৃত্র-সংহার ও পলাশীর যুদ্ধের আসল কথা যে কি, তা শেষ তিনখানির নামেই পরিচয়। প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও, অপর সব মহাকাব্যও হচ্ছে বীরগাথা, যথা—শিশুপাল বধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম, পৃথ্বিরাজ, শিবাজি প্রভৃতি। এ শ্রেণীর একখানি কাব্য আছে, যার বিষয়টা একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু একটুখানি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, Paradise Lost-এর বিষয়ও হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, সয়তানের সঙ্গে ভগবানের যুদ্ধ।

তারপর সকল দেশের সকল ইতিহাস যুদ্ধের ইতিহাস। আর সকল দেশের সকল বিদ্যালয় ঐ সব কাব্য ইতিহাসই ছেলেদের পড়ান; এবং তা ছাড়া আর কিছু পড়ান না। ধরুণ যদি আমাদের অপর কোনও মহাকাব্য না থাকত তাহলে এ দেশের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে "ছুছুন্দরীবধ কাব্য" পাঠ্যপুস্তক করতেন, সে বিষয়ে আপনার মনে কি সন্দেহ আছে? রবীন্দ্র নাথের কাব্য বধ কাব্য নয়, অতএব তা বদ কাব্য। এই হিসাবেই সে কাব্যের বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ। অপর পক্ষে যে নাটকের বিষয় হচ্ছে চুলবাঁধা, তাও Text book হয়েছে, "বেনিসংহার" এই নামের গুণে। কাব্য ইতিহাস ছেড়ে আর কোনও শাস্ত্র ধরলেও যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার নেই। কৌটীল্য থেকে সুরু করে শুক্রনীতি পর্য্যন্ত সকল নীতিশাস্ত্র ত মলাট থেকে মলাট পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন আয়োজনের বিচারে ভরপুর। নীতি ছেড়ে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়েও কোনও লাভ নেই। মনু যুদ্ধের বিষয় দুদশ পাতা লিখে ও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য চানক্যের উপর বরাত দিয়েছেন। তার পর যদি পুরাণ ধরা যায় ত সেখানেও একই কথা। মার্কণ্ডের চণ্ডীর কথা কোন বাঙালী না জানে? চণ্ডীপাঠ ছেড়ে যদি গীতাপাঠ করি তাহলেও শুনি "যুদ্ধায় যুজ্যস্ব"।

এই শিক্ষা পেয়েই মানুষ যখন মানুষ হয়েছে, তখন যুদ্ধপ্রীতি ও বীরভক্তি মানুষের মনে শিকড় গাড়তে বাধ্য।

তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎমুখী নয়। সুতরাং এতেও আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। বিশেষতঃ এই সব দলিলই যখন প্রমাণ যে, যুদ্ধপ্রীতি আমাদের মনে পুস্তক জাত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত।

(৬)

একজন ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে কবিতা লেখেন তাঁরা যাঁরা যুদ্ধ কখনও করেনও নি দেখেনও নি; আর যুদ্ধ সম্বন্ধে কবিত্ব করেন তাঁরা যাঁরা যুদ্ধ কখনো করবেনও না দেখবেনও না। কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা উক্ত লেখক Pegoui গতযুদ্ধে রণক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন। অতএব যাচিয়ে দেখা যাক্ ও কথার ভিতর কতটা সত্য আছে।

প্রথমতঃ মহাকবিদের ধরা যাক্। হোমার কখনো যুদ্ধ করেন নি, কেননা তিনি রাজা ছিলেন না, ছিলেন ফকির। তারপর তিনি যুদ্ধ কখনই দেখেন নি, কেননা তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। বেদব্যাস ছিলেন ঋষি, অতএব স্বীকার করতেই হবে, যে তিনি কখনো যুদ্ধ করেনও নি দেখেনও নি। তপোবনে যখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তখন সেখানে যে যুদ্ধ হয় না তা বলাই বাহুল্য। বাল্মীকিও ছিলেন মুনি, উপরন্তু তিনি রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর আগে রামায়ণ লিখেছিলেন, সুতরাং রামরাবণের যুদ্ধে তিনি যোগও দেন নি, এবং তা চোখেও দেখেনও নি। মাইকেল ছিলেন ব্যারিষ্টার, হেমচন্দ্র উকিল, আর নবীন চন্দ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, অতএব যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের যতটা পরিচয় আছে তাঁদেরও ততটাই ছিল।

প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসা যাক্। ভারবি যে চরিত্রে আরবি ও মাঘ বাঘ ছিলেন, তার কোনই প্রমাণ নেই। আর পৃথ্বিরাজের বাঙালী চাঁদকবি হচ্ছেন মাষ্টারমশায়। এইত গেল লেখকদের কথা। তারপর জনগণের চরিত্রের পরিচয় নেওয়া যাক্।

দুপুর রাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে মথুরার গোপিনীরা যেমন

কোলের ছেলে ও হাতের কাজ ফেলে বৃন্দাবনে ছুটে গিয়েছিল, দিন দুপুরে বড় রাস্তায় গড়ের বাদ্যি শুনে, যে সব স্ত্রী পুরুষ কোলের ছেলে ও হাতের কাগজ ফেলে বাড়ীর বারেণ্ডা ও জানালায় ছুটে যায়, তারা যে কখনো যুদ্ধ করবে না ও দেখবে না, সে ত স্বতঃসিদ্ধ।

এর থেকে মনে হয় যে Pegouiর কথা সত্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে সে কথা পুরো সত্য নয়। মসীজীবী যেমন রণ বিলাসী হয় অসিজীবীও তেমনি রণোন্মত্ত হতে পারে। আসল ঘটনা এই যে, যে ব্যক্তি একধারে মসীজীবী ও অসিজীবী শুধু তারই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনরকম sentimentality নেই।

(৭)

পুরাকালে গ্রীসে Æschylus ও Euripides উভয়েই ছিলেন, একধারে কবি ও সেনাপতি। এস্কিলাসের Agamemnon এর কোরাস আর ইউরিপিডিসের Trojan women পড়ে দেখবেন তাতে যুদ্ধের terror এবং pity ছাড়া আর কিছুই নেই। ও দুখানি নাটকের খাঁটিরস করুণরস, বীররস নয়। বর্ত্তমান ফিরে এলেও ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। ইউরোপের এযুগের তিনটী বড় কবির গদ্য কাব্যে যুদ্ধ ব্যাপারটাকে যেমন ভীষণ ও বীভৎস ভাবে দেখানো হয়েছে, এমন আর কোনও কাব্যে হয় নি। Tolstoi, Guy de Maupassant ও Barbusse এই তিনটি কবিই যোদ্ধা। আমি ইউরোপের আরও দু চার জন বড় লেখক জানি যাঁরা অর্দ্ধেক জীবন রণক্ষেত্রে কাটিয়েছিলেন, অথচ তাঁদের লেখায় যুদ্ধের নাম

পর্য্যন্ত নেই। এর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে যুদ্ধপ্রীতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়।

নীতিশাস্ত্রে যুদ্ধের মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন থাকলেও মোক্ষশাস্ত্রে নেই। এর কারণ উপনিষদ ক্ষত্রিয়ের লেখা। তারপর অহিংসা পরমধর্ম্ম, এই বাণী যিনি প্রচার করেছিলেন, তিনিও ছিলেন ক্ষত্রিয়, আর যে সে ক্ষত্রিয় নয়, একাবারে রাজপুত্র। আর ভারতবর্ষের যে রাজা, পাষাণের মুখে অহিংসার বাণী অক্ষয় করে গিয়েছেন, সেই অশোকের তুল্য নরহত্যা এদেশে পূর্ব্বাপর কোন রাজাই করেন নি।

লোকে বলে যে এই অহিংসার বাণী হচ্ছে মানুষের super-human nature-এর বাণী। তা যদি হয় ত যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল, মানুষের super nature-ও পাওয়া যাবে না।

যা sub-nature-ও পাওয়া যায় না super nature-রেও পাওয়া যায় না, তা যদি কোথাও পাওয়া যায় ত human nature-রেই পাওয়া যাবে। এবং মানব-মনের যাতে পূর্ণ প্রকাশ তাতেই অর্থাৎ কাব্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, মহাকাব্যেও তা মেলে না।

ইলিয়াড, মহাভারত, রামায়ণ এ তিনখানি কাব্যেই কবি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজ নিজ নায়কের শত্রুর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। জিনিষটিকে তাঁরা যদি পাপ মনে না করতেন, তাহলে তা পরের ঘাড়ে চাপাবার প্রয়োজন কি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ও তিনের অন্ততঃ দুখানি কাব্য রূপক কাব্য, অর্থাৎ Paradise Lost-এর আদি সংস্করণ। রামায়ণ মহাভারতের যথার্থ বিষয় হচ্ছে, অবতীর্ণ সয়তানের সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবানের লড়াই। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত দুটি nature-এর লড়াইয়ের ব্যক্ত চিত্র।

তারপর দেখা যাক ও সকল কাব্যে মানুষে কি পেয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যে গোটা মহাভারত নিংড়ে পাওয়া যায় শুধু "শান্তরস", আর রামায়ণের রস যে করুণ তার প্রমাণ সংস্কৃতের আদি শ্লোক। ব্যাধকে ক্রৌঞ্চবধ করতে দেখে যে কবির শোক শ্লোকে পরিণত হয়েছিল তাঁকে অবশ্য Bernhardiর মাসতুতো ভাই বলা চলে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে human natureও যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে।

মানুষের অধঃ ঊর্দ্ধ ও মধ্য কোনরূপ প্রকৃতিতেই যুদ্ধের মূল আমি খুঁজে পাই নি বলেই আপনার কাছে তার সন্ধান নিতে এসেছি।

যদি বলেন যে, যার মাটিতে মূল নেই তার অস্তিত্বও থাকতে পারে না, তাহলে আপনি ভুল কথা বলবেন। মাটিতে যার মূল নেই অথচ যা দিব্যি বেঁচে থাকে উপরন্তু বেজায় বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে এমন জিনিষ আপনিও দেখেছেন আমিও দেখেছি যথা "অলোক লতা"। এ জাতীয় পরের ঘাড়েচড়া আর তার রক্তশোষী উদ্ভিদকে ইংরাজেরা parasite বলেন। মানুষের মনে যুদ্ধ প্রবৃত্তি কি ঐ জাতীয় একটা প্রক্ষিপ্ত অপসৃষ্টি?

বীরবল।

১লা মে, ১৯২২।

যুদ্ধের কথা।

(উত্তর)

শ্রীযুক্ত "বীরবল" মহোদয়—

সমীপেষু।

আপনার আলাপী এত সব পণ্ডিত লোক থাক্‌তে এই যুদ্ধ জিজ্ঞাসা চিঠিটার শিরোনামায় কেন যে আমার নাম বসিয়ে দিলেন, তা ভেবে একটু চিন্তিত হয়েছি। কেননা আপনার কলম যা লেখে, তার কোথাও না কোথাও কিছু বিদ্রূপ আছে, এ বাঙ্গালী পাঠকদের জানা কথা। আর যে চৌদ্দশাস্ত্রের পারগামী না হলে, ও জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া চলে না তার একটারও যে জলস্পর্শ করে নি, তাকে ঐ প্রশ্ন করার বিদ্রূপটা ত অতি স্পষ্ট। কিন্তু সেটা প্রধানত হ'ল, আপনার পণ্ডিত বন্ধুটীর উপর যিনি ঐ চৌদ্দ "লজির" লিষ্টি তৈরী করেছেন। সুতরাং ও চিঠিতে আমার নাম যোগের মধ্যে আরও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে, আর সেটা আপনার নানা পাঠকের বুদ্ধিতে কতরূপে প্রকট হবে তা যথার্থ আশঙ্কার কথা। কিন্তু চিঠি যখন আমার নামে দিয়েছেন, তখন মরিয়া হয়ে ও সম্বন্ধে দুই একটা মনের কথা খুলে বলব স্থির করেছি। গত মহাযুদ্ধের ফলাফল দেখে যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কথা সবারি মনে জন্মেছে। আর ও যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধের পরে, ইউরোপের পণ্ডিতেরা এবিষয়ে এত লেখা লিখেছেন ও

লিখছেন যে তার কিছু না কিছু চোখের ভিতর দিয়ে মনে প্রবেশ করে' সেখানে একটু আধটু গোলমালের সৃষ্টি করেছেই।

যে যুবকটি "যুদ্ধ মানুষের nature, সুতরাং মানুষ যতদিন পৃথিবীতে টিঁক্‌বে ততদিন সে যুদ্ধ কর্‌বেই" আপনার সঙ্গে এই তর্ক করেছে, মানুষের ইতিহাসের সাক্ষী যে তারি পক্ষে একথা স্বীকার কর্‌তে হবে। এক কথায় দেশ কি জাতির ইতিহাস যে কতকগুলি যুদ্ধ পরম্পরার বিবরণ এ ত যে কোনও ইতিহাসের পুঁথি হাতে নিজেই দেখা যায়। আর মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে একথা আমাদের দেশের ইস্কুলের সকল ছেলেই জান্‌ত।* আপনার পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাসের নামে নাসা কুঞ্চিত করেন তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, যে ইতিহাস সাহিত্যের সব মহাগ্রন্থেরও এই শিক্ষা। ও সাহিত্যের ইউরোপে দুই মহাপুরুষ হলেন হিরোডোটাস্ ও থিউসিডাইডস্। আর এদের লেখার মোহে বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ। এর মধ্যে থিউসিডাইডসের পুঁথি হল স্পষ্ট বলাকওয়া সাতাশ বছর ব্যাপী এক যুদ্ধের ইতিহাস। আর হিরোডোটাসের প্রকাণ্ড নয় খণ্ড পুঁথির যদিও কেবল শেষ তিন খণ্ড গ্রীস ও পারস্যের লড়াই-এর ইতিহাস, কিন্তু ওর প্রথম ছয় খণ্ড নাকি ঐ যুদ্ধেরই উদ্দেশ্য পর্ব্ব মাত্র। "The last three books of Herodotus give the history of the invasion of Xerxes and its repulse; the first six form a sort of introduc-

* আমার বিশ্বাস ও যুবকটির মাট্রিকুলেশনে ইতিহাস ছিল "অপ্‌শনাল" বিষয়, আর আই, এ, ও বি, এ, তেও ও ইতিহাস পড়েছে।

tion to them.....The connection is at first loose, visible only as we go on we begin to feel the growing intensity of theme—the concertation of all the powers and nations to which we have been gradually introduced, upon the one great conflict." (১) অর্থাৎ ঐ যে ছয় খণ্ড জোড়া নানা দেশ ও জাতির রকমওয়ারী বর্ণনা তার আকর্ষণ মানুষের বিবরণ হিসাবে নয়, একটা মহাযুদ্ধের পক্ষ হিসাবে।

এর যা চল্‌তি উত্তর তা সবাই জানি। ইতিহাস লেখকেরা এ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসের ধারাটি ঠিক ধর্‌তে পারেন নি। মানুষের ভাঙ্গা গড়া ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে, যুদ্ধ প্রায় একটা অবান্তর ও অত্যন্ত অপ্রধান ঘটনা। কিন্তু জিনিষটা খুব চমকপ্রদ ও জমকালো হওয়াতে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস ঐ ঘটনা গুলিকেই বেশী স্মরণ করে রেখেছে; এবং ঐতিহাসিকেরা কতকটা মোহে আর কতকটা পুঁথি জমিয়ে তোলার লোভে যুদ্ধের নানারঙে তাদের পুঁথি রাঙিয়েছেন। এ হয়ত সত্য। কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটা কেবল মানুষের ইতিহাসের পুঁথি জুড়ে নেই, ঐতিহাসিক মানুষের মনও যে কতটা জুড়ে রয়েছে তা আপনি প্রাচীন ও নবীন নানাশ্রেণীর কাব্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। আমাদের বর্ত্তমান নির্ব্বিরোধ পলিটিকাল আন্দোলনের ভাষা কি পরিমাণে যে বিরোধের অভিধান থেকে ধার করা তাত আপনার চোখে এড়ায় নি। যদি কাব্য ও পলিটিক্‌স্ ছেড়ে একবারে অধ্যাত্মতত্ত্ব কথায় কান দিতেন সেখানেও উপনিষদের "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা" ইত্যাদি থেকে রামপ্রসাদের

(১) গিলবার্ট মারের History of Ancient Greek Literature. পৃঃ ১৫৬।

"আয় মা সাধন সমরে" পর্য্যন্ত ঐ একই কথার প্রমাণ পেতেন। মোট কথা যতদিন মানুষের মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায় অর্থাৎ গত পাঁচ ছয় হাজার বছর, ততদিনই দেখা যায় যে, বরাবর সে ছোট বড় যুদ্ধ করে আস্‌ছে। এবং এও বেশ জানা যায় যে ঐ যুদ্ধকে সে তার ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড ও প্রধান ঘটনা রূপে দেখে আসছে। যদি এই প্রমাণে কেউ বলে যে যুদ্ধ মানুষের nature; অর্থাৎ ও যখন এতদিন ধরে মানুষের সমাজে কায়েম হয়ে বসে রয়েছে তখন মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ওর কারণ আছে, আর সে কারণ একেবারে মানুষের মূল প্রকৃতির অংশ, তার আর বদল সম্ভব নয়—তবে আমার মনে হয় না যে সরকারি আদালতে তাকে নিরুত্তর করা চলে। কেননা আমার মতে নিরপেক্ষ বিচারে, প্রমাণ অর্থাৎ অপ্রমাণের ভারটা হ'ল বিরুদ্ধ বাদীর উপর। সুতরাং এঁদের যুক্তি তর্কই বিচার করা দরকার।

গত মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে শ্মশান-বৈরাগ্যের মত যে যুদ্ধ বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে তার উত্তেজনায় অনেকে প্রমাণ করছেন যে যে মানুষের প্রকৃতির মূলে যুদ্ধ আদবেই নেই, ওটা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। এবং মানুষের প্রকৃতির যখন বিশুদ্ধ সংস্করণ বেরুবে ও প্রক্ষিপ্ত অংশটা তখন ছাঁট পড়বে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে যুদ্ধ আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাক্‌বে না; ওটা মাঝের দুদিনের একটা বিভীষিকা মাত্র। একটা পুঁথিকে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাক্। আপনার পাঠকদের অনেকেই নিশ্চয় মিথুন-তত্ত্বজ্ঞ হ্যাভেলক্ এলিসের নাম জানেন। তিনি 'যুদ্ধ সময়ের প্রবন্ধাবলী' নাম দিয়ে যে দু খণ্ড বই বের করেছেন তার দ্বিতীয় খণ্ডে 'যুদ্ধের উৎপত্তি'

Numbering Error

(The Origin of War) ও "বিরোধের তত্ত্বকথা" (The Philosophy of Conflict) নামে দুটী প্রবন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি তর্ক অল্প কথায় বেশ গুছিয়ে বলেছেন। এঁর প্রথম কথা হ'ল যে যুদ্ধ মানুষের nature নয় কেননা চিরকাল মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না। ও আগুন্তুক, ঘরের ছেলে নয়। যতদিনের ইতিহাস আছে ততদিন যে যুদ্ধও রয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু মানুষের আয়ুকালের তুলনায় তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ তার ঐতিহাসিক যুগের চেয়ে অন্তত লাখ গুণ বেশী লম্বা। মানুষের ইতিহাস পাওয়া যায় এখন থেকে বড় জোর পাঁচ ছয় হাজার বছরের, আর মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে সম্ভব পাঁচ দশ লাখ বছর। সুতরাং ঐ শেষ কটা দিনের ব্যাপার দেখে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলা চলে না। এই তর্কে বিপক্ষের প্রমাণের দুর্বলতা দেখিয়ে স্বপক্ষের প্রস্তাব প্রমাণের জন্য নৃবিদ্যা আর প্রত্নবিদ্যা Anthropology ও Archæology এই দুই বিজ্ঞানকে বিরুদ্ধবাদীরা সাক্ষী মানেন। এই দুই বিজ্ঞান নাকি বিংশ শতাব্দীতে একযোগে প্রমাণ করেছে যে আদিতে মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না; ও জিনিষটা এই অল্প কিছু দিনের নতুন আমদানী। নৃবিদ্যা নাকি এখন আবিস্কার করেছে যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী' দক্ষিণ আফ্রিকার বুস্‌ম্যান আর গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো এ সব অসভ্য জাতি ইউরোপে আদিপ্রস্তর যুগে, ধরুন এখন থেকে পনর বিশ হাজার বছর আগে, যে সব নানা জাতির মানুষ ছিল তাদেরি বংশধর। এদের পূর্ব্ব পিতামহেরা ইউরোপের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে সেখানে না টিকতে পেরে এই সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নৃবিদ্যার পণ্ডিতদের কেউ কেউ

এই সব অসভ্য জাতিদের ভাল করে দেখে শুনে এখন মত দিয়েছেন যে যুদ্ধ জিনিষটা প্রকৃত পক্ষে এই সব অসভ্য জাতির সমাজে নেই। মারামারি, খুনাখুনি অল্প বিস্তর থাকতে পারে, কিন্তু সে প্রায়ই দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব, না হয় একদিকে দুচার জন অন্য পক্ষে দুপাঁচ জন। এবং তার লক্ষ্য প্রায়ই দোষীর দণ্ড বিধান। দল বেঁধে অন্য বাঁধা-দলকে, যে দলকে-দল খুনের চেষ্টার নাম যুদ্ধ, তা এ সব অসভ্য সমাজে নেই। এ থেকে অনুমান করা হয় যে তাদের পূর্ব্ব-পুরুষ আদি প্রস্তর যুগে মানুষের সমাজেও যুদ্ধ ছিল না ও জিনিষের মানবসমাজে অনেক পরে জন্ম হয়েছে। এবং যে অবস্থার ফেরে তা হয়েছে এই অসভ্য জাতিগুলি ঘটনাক্রমে সে অবস্থায় না পড়ায় তাদের সমাজে সেই পূর্ব্বের ভাব অর্থাৎ যুদ্ধের অভাব এখনও বহাল আছে। এ যুক্তিতে অবশ্য ফাঁক আছে। কেননা এমনও ত হতে পারে যে যুদ্ধ মানুষের সমাজে বরাবরই আছে, কেবল ঐ দুই একটা ছোট খাট মানুষের দল পৃথিবীর কোণে কাণ্‌চেতে অতি বেতর রকম অবস্থায় পড়ায় তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধ লোপ পেয়েছে। আর এদের অবস্থা যে অসাধারণ তাত এতেই বোঝা যায় যে মানুষের জন্মের আদি থেকে এ পর্য্যন্ত তারা অসভ্যই রয়ে গেছে; কোনও রকম সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে নি। এই ফাঁক পুরণের জন্য সাক্ষী মানা হয় প্রত্নবিদ্যা বা Archæologyকে। প্রত্নবিদেরা মাটি খুঁড়ে আদিপ্রস্তর যুগের মানুষদের যে সব কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে নাকি যুদ্ধে মরলে যে রকম আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা তা মোটেই দেখা যায় না। আর অস্ত্র শস্ত্র যা পাওয়া গেছে তা সবই পশু শিকারের সরঞ্জাম, একটিও মানুষে মানুষে যুদ্ধের হাতিয়ার

নয়। এবং এদের আঁকা যে সব ছবি আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে শিকারের ছবি আছে, মানুষে পশুতে লড়াই এর ছবি আছে, কিন্তু কোনও যুদ্ধের ছবি নাই। এই দুই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ জোড়া দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন তাদের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়েছে। আদিকালে মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না।

যারা বলেন যুদ্ধ মানুষের সমাজে চিরকালই ছিল, তাদের একটা প্রমাণ ইভলিউশন থিওরির প্রমাণ। পশু থেকে যে মানুষ হয়েছে, এ কথাকে ঠাট্টা করা চলে, কিন্তু অবিশ্বাস করা চলে না। পশুদের মধ্যে যুদ্ধ আছে, এমন কি লেগেই আছে। সমস্ত ঐতিহাসিক কালটা মানুষের মধ্যে যুদ্ধ আছে। কেবল মাঝখানটা যখন মানুষ পশুর অনেকটা কাছাকাছি ছিল, তখনি তাদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল না, একথা অশ্রদ্ধেয়। এর জবাবে বিরুদ্ধবাদীরা দেখিয়ে দেন, যে মনুষ্যেতর প্রাণিদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে আছে এটা মনে করা মহাভুল। যে পিঁপড়ে ও মৌমাছির আপনি নাম করেছেন, তারা ছাড়া আর কোনও প্রাণি যুদ্ধ, অর্থাৎ একই জাতিয় প্রাণীর একদল আর এক দলকে আক্রমণ করে না, আর ডারউইন যে strugle for existence-এর কথা বলেছেন তার মধ্যে যুদ্ধের, কি জীবে জীবে লড়াই-এর কোনও সম্পর্ক নেই! আপনি struggle for existence-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন "মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম" তা আপনার পাঠকেরা "বীরবলী" ব্যাখ্যা বলে মনে করবেন কি না জানি নে, কিন্তু ওটা খাঁটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, একবারে ডারউইনের নিজের কথা। ও struggle-এ যে জীব মারা যায়, সে হাতে নয় ভাতে। এই যে যত জীব জন্মে তার অতি অল্প কিছু অবশিষ্ট থাকে আর বাকী সবই

মারা যায় সে লড়াই করে নয়, না খেতে পেয়ে। যে খাবার আছে, তাতে সবার কুলোয় না, সুতরাং জোরদার কজনা দল বেঁধে বাকী গুলিকে মেরে ফেলে নিজের জন্য সবটা খাবার দখল করল এটা সভ্য মানুষের ব্যবস্থা হতে পারে, পশুদের মধ্যে ঘটা অবস্তব।* Survival of the fittest-এর "ফিট্‌নেস্" অপরকে হত্যা করার "ফিট্‌নেস্" নয়, নির্দ্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার "ফিটনেস্"।

আপনার তার্কিক যুবকটি যদি এই যুক্তি তর্কেই নিরুত্তর হয়ে যায় তবে বুঝব যে-দেশে "ন্যায়ের বিধান দিল, শিরোমণি" তার সম্মান সে রাখতে পারলে না। যথার্থ তার্কিকের কাছে এর মধ্যে চুক কত দেখুন ঃ—

পশুদের মধ্যে যুদ্ধ নেই? বেশ কথা। যুদ্ধ পশুর nature-ত বলি নি, বলেছি মানুষের "নেচার"। পশুপ্রকৃতি আর নরপ্রকৃতি যে একবারে এক, একথা কোন নরাধমও বলে না। বরং এতে প্রমাণ হ'ল যে যুদ্ধ মানুষের বিশেষ ধর্ম্ম; যা না থাকলে মানুষ হয়ত পশু হবে।

Anthropology আর Archæology প্রমাণ করেছে, আদি মানব সমাজে যুদ্ধ ছিল না? ঐ দুই বিজ্ঞানের মতবাদগুলির পরমায়ু কত? আর যে মতগুলি "সুপ্রতিষ্ঠিত" তার প্রত্যেকের স্বপক্ষে যত পণ্ডিত, বিপক্ষে তত পণ্ডিত কি না? আর এ সব কথা যদি ছেড়েও দিই ঐ বিশিষ্ট সাক্ষী Archæology-র প্রমাণটী দাঁড়াল

* ও ঘটনাকে ডারউইন natural selection বল্‌তেন না; ওটা পড়ে artificial selection-এর পর্য্যায়ে।

কেমন? যুদ্ধে মরা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় নি, সুতরাং ওযুগে যুদ্ধে কেউ মরে নি! যুদ্ধের অস্ত্র পাওয়া যায় নি, ত যুদ্ধ কেউ করে নি! যুদ্ধের ছবি দেখা যায় না ত যুদ্ধের ছবি কেউ আঁকেই নি! জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কি, আদি প্রস্তরযুগের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছরে পৃথিবীতে মানুষ জন্মেছিল কত, আর সে যুগের মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে কটি? তারা যত অস্ত্র গড়েছিল, আর যত ছবি এঁকেছিল তার কি পরিমাণ আবিস্কার হয়েছে, বা কোনও দিন কি হবার সম্ভবনা আছে? ডারউইন যে তার Origin of species-এর পুঁথিতে Palæontology বা প্রত্নপ্রাণি-বিদ্যায় ভাবাত্মক প্রমাণই প্রমাণ, অভাবাত্মক প্রমাণ প্রমাণ নয় দেখবার জন্য একটা গোটা অধ্যায় লিখেছিলেন তা কি সাবাই ভুলে গেছে নাকি? "জানি না ত ছিল না" এ যুক্তি কি এক্ষেত্রে চলে? কেননা যা জানি যা জানতে পারা যাবে তা, যা ছিল তার তুলনায় একরকম কিছুই নয়।

ধরেই যদি নেওয়া যায় যে যুদ্ধ আদি প্রস্তরযুগের বা "পেলিও-লিথিক্" যুগের মানুষের "নেচার" নয়, মেণ্ডেল আবিস্কার হবার পর, আর ডিভ্রিসের অলোচনা সামনে থাকতে এমন কোন মূর্খ আছে যে না জানে যে জীব শরীরে অনেক পরিবর্ত্তন হঠাৎ আসে, কিন্তু স্থায়ী হয়ে বংশপরম্পরা চলতে থাকে। আর এই সব "রিভলিউশানের" যোগ করেই যে "ইভলিউসন" এইত হালের মত। অবশ্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজ, বাঙ্গালা দেশের গর্ভণর, ন্যাশানাল লিবারেল লিগের সভ্য এদের মত আলাদা। আর খৃষ্টানি মতেও আত্মার আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই। যুদ্ধ মানুষের সমাজে অনাদি নয় এতেই কি প্রমাণ হল যে অন্ত পর্য্যন্ত সে ওখানে থাকে না। লেখাপড়াও

মানুষের সমাজে অনাদি নয়, কিন্তু এ আশা কি করা চলে যে জঞ্জাল একদিন সেখান থেকে বিদায় হবে!

যুক্তিটি এ সব তর্ক তুলবে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু সত্য কথা এই যে "মানুষ এতকাল যুদ্ধ করছে সুতরাং চিরকাল করবে" এও যেমন কেবলান্বয়ী, "এম্পিরিক্" যুক্তি, "মানুষ অল্পকাল যুদ্ধ করছে সুতরাং চিরকাল করবে না" এও তেমনি "এম্পিরিক" যুক্তি মাত্র। কার্য্যকারণের সঙ্গে যোগ না থাকায় ও দুই-এরই ভিত কাঁচা। আর এও ঠিক যে প্রশ্ন করে মানুষের সমাজে চিরদিন যুদ্ধ থাকবে কিনা সে কিছু এ জানতে দেয় না যে পৃথিবীজোড়া হিমপ্রলয়ে যদি বেশীর ভাগ লোক মরে যায়, আর যারা বাকী থাকে তারা বনে' যায় "এস্কিমো" তবে তাদের মধ্যে যুদ্ধ থাকবে কিনা। ও জিজ্ঞাসার সরল অর্থ আমরা যাকে সভ্যতা বলি, আর তার গতি ও পরিণতি অনুমান করতে পারি, তাতে সভ্য মানুষের সমাজ থেকে যুদ্ধ লোপ হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে যা অনুসন্ধান করতে হবে তা মানুষের মধ্যে যুদ্ধ কবে এল নয়, কেন এল। শ্বেত বরাহ কল্পে যুদ্ধ ছিল কিনা, আর কল্পান্তে যুদ্ধ থাকবে কিনা এ দুপ্রশ্নের কোনটির বা দুটিরও উত্তরে ও জিজ্ঞাসার শান্তি হবে না!

আপনি হয়ত মনে ভাবছেন এ স্পষ্ট কথাটা এত করে' বলছি কেন। তার কারণ আছে। আমার সন্দেহ হয় যেমন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের জার্ম্মান অজার্ম্মান "মিলিটারীষ্টরা" "বায়লজির" সরাসরি প্রমাণ করেছিলেন যে, যুদ্ধ মানব সমাজে অক্ষয়, তেমনি যুদ্ধের পরে ইউরোপের "প্যাসিফিষ্টরা" "আরকিওলজির" প্রমাণে সরাসরি প্রমাণ করছেন মানব সমাজে থেকে যুদ্ধের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

এ দুএর মধ্যেই যুক্তির জোরের চেয়ে গরজের জোর বেশী। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হ্যাভেলক এলিসের যে "বিরোধের তত্ত্বকথা" নামে প্রবন্ধের নাম করেছি তার এক জায়গায় তিনি বল্‌ছেন, দেখ্‌তে পাওয়া যায় বালকদের মারামারির প্রকৃতিটা মোটামুটি নয় বছর থেকে বারবছর পর্য্যন্ত থাকে। এ থেকে কল্পনা করা অসঙ্গত নয় যে যুদ্ধ মানবজাতির পৌগণ্ডকালের একটা অস্থায়ী ঘটনা মাত্র। জাতির শৈশবেও ছিল না, যৌবনেও থাক্‌বে না। কেননা প্রতি জীবের জীবনের ইতিহাস তার জাতির ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। আপনার পাঠকদের অনেকে হয়ত জানেন যে ভ্রূণবিদ্যা বা "এম্‌ব্রিওলজি" ইভলিউশন থিওরীর একটা বড় পোষক প্রমাণ। মাতৃগর্ভে যে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে জীব ভূমিষ্ট হবার পূর্ব্বে নিজের জাতীয় শরীর ও চেহারা পায় সে পরিবর্ত্তন তার জাতির লক্ষ বছরের ক্রমপরিবর্ত্তনের যে একটা অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এ মনে করার কারণ আছে। সুতরাং ভ্রূণের ক্রমবিকাশ জাতির আদি থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের একটা মোটামুটি ধারণা করে দেয়। কিন্তু এ সম্বন্ধ হ'ল কার্য্যকারণের সম্বন্ধ। জাতির সমস্ত অতীতের চাপ, অর্থাৎ তার পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতির চাপ প্রত্যেক জীবের উপর রয়েছে। এই চাপই ভ্রূণের বিকাশের ক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং জাতির ভবিষ্যৎ জীবের বিকাশের মধ্যে দেখা দেবার কোনও কারণ নেই। ও কল্পনা কবিত্বহিসাবে হয়ত মন্দ নয় কিন্তু বিজ্ঞানে অচল। এবং হ্যাভেলক এলিসের মত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত যখন ওকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে চালাতে চান তখন "গরজ বড় বলাই" ছাড়া আর কি ভাবতে পারেন।

একটু প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক্। যুদ্ধের আদিকারণ ধনের লোভ। মানুষ প্রথমতঃ প্রধানতঃ ছিল শিকারী। দিনের প্রয়োজন তাকে একদিনে সংগ্রহ কর্‌তে হত! এবং সে কাজ সচরাচর দল বেঁধে করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মানুষ চিরদিনই ছোট বড় দলে বাস কর্‌লেও দলের সম্পত্তি বলে কোনও জিনিষ তার এখন জীবনে বড় একটা গড়ে উঠ্‌তে পারেনি। মানুষের বুদ্ধি একদিন তাকে এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিল। প্রয়োজন ও ভোগের সামগ্রী নিত্য জোগান পাবার কৌশল আবিষ্কার করে, তার উপায় ও উপাদান মানুষ আত্মসাৎ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ভূ হল সম্পত্তি এবং তা থেকে আহার্য্য আদায়ের জন্য মানুষের দল তাকে ঘিরে ঘ্যাঁসাঘেঁসি বাসা বাঁধল্। শিকার ছেড়ে মানুষ হল কৃষক। মোটামুটি বলা চলে সেইদিনই হ'ল মানব-সমাজে যুদ্ধের জন্মদিন। কেননা, এমন এক জিনিষের সৃষ্টি হ'ল, যা একদলের কেড়ে নেবার লোভ ও অন্য দলের রক্ষা করবার চেষ্টা একসঙ্গে জাগিয়ে তোলে। সম্পত্তি সৃষ্টির সঙ্গে মানুষ যখন ধাতু দিয়ে মারাত্মক অস্ত্র সব গড়তে শিখ্‌ল তখন দলের সঙ্গে দলের বিরোধের চেহারা হল আমাদের পরিচিত যুদ্ধের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। আপনি যে পিঁপ্‌ড়ের যুদ্ধ দেখেছেন, আর মৌমাছির যুদ্ধের কথা শুনেছেন তারও সম্ভব কারণ এইখানে। এই দুটি প্রাণী মানুষের মত দল বেঁধে সম্পত্তি অর্জ্জন ও সঞ্চয় করে, এবং যুদ্ধের অস্ত্র বিধাতা এদের শরীরের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। অবশ্য যুদ্ধ যখন মানুষের সমাজে এল তখন নিজের আর দশটা সৃষ্টির মত ওর উপরেও মানুষের মমতা পড়েছে, বুদ্ধি ধন ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও প্রতিষ্ঠানেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছে।

কর্ম্মের বিভাগে এ কর্ম্মের জন্যও একটা পৃথক বর্ণের নিরূপণ হয়েছে। এবং সে বর্ণের লোকেরা অনন্যকর্ম্মা হয়ে যুদ্ধকে বিদ্যা ও কলা দুই রকমেই গড়ে তুলেছে। মহাভারতখানা হাতের কাছে নেই বলে' তুলে দেখাতে পারলুম না; শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যপর্ব্বধ্যায়ে কৃষ্ণ আর কর্ণের চোখে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চেহারাটা কেমন দেখিয়েছে। পাছে এতদিনের আকাঙ্খিত পরিণামটা আপোষের প্রস্তাবে মাটি হয়ে যায় এতে কর্ণের কি ব্যাকুল আশঙ্কা। কর্ণের যুদ্ধাকাঙ্খার মূলে লোভ নেই, ক্রোধও নেই, রয়েছে শিল্পের উপর শিল্পীর যে টান। কর্ণ কেবল যুদ্ধ বিদ্যার আচার্য্য নন, তিনি যুদ্ধকলার আর্টিষ্ট। এমনি করে, যেমন মানুষের আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠান তেমনি যুদ্ধেও যে মনোভাবে ওর উৎপত্তি তার চারপাশে ছোট বড়, উঁচু নীচু বহুভাব জমে উঠে তাকে পুষ্টি দিচ্ছে, নানা রঙীন তুলিতে তাকে রঙাচ্ছে। কিন্তু সব রকম সাজসজ্জা ও মুখোষের মধ্য দিয়েও সেই আদিম মানবের চেহারা দেখা দেয়। এই যে গত মহাযুদ্ধে দু' পক্ষের কোনও জাতিই বিশ্বমানবের হিত ছাড়া আর কোনও কথাই উচ্চারণ করে নি, তবুও মন্দলোকের চোখে পরেছে যে এর মধ্যে পৃথিবীর নানা জায়গার মাটির কথা, খনির কথা ও তেলের কথাও রয়েছে। যুদ্ধ যে ডাকাতির রাজসংস্করণ এটা কেবল আলেকজেণ্ডার ও দস্যুর গল্পে ছেলেদের পাঠ্যপুঁথির 'মরাল' নয়, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে যাচাই করা খাঁটি সত্য।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা বল্লুম তার সোজা কথা ত এই মানুষের সভ্যতার যেখানে শিকড়, যুদ্ধেরও সেইখানেই মূল। তাই কেউ কেউ সন্দেহ করেন ওর একটাকে ছেড়ে আর একটাকে রাখা চল্‌বে না।

কাটতে গেলে দুই-ই একসঙ্গে কাটা পড়বে। এতটা নিরাশার বোধ হয় সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, চোখ না বুজে একথা বলা যায় না যে, যে সব কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি ও স্থিতি তা লয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে দলে দলে স্বার্থের সংঘর্ষ যুদ্ধের মূল সে দলের বর্ত্তমান আকারের নাম "নেশন"। আপনার মুখেই শুনেছি—একজন ফরাসী পণ্ডিত দেখিয়েছেন 'নেশন' কথাটা ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে খুব প্রাচীন, কিন্তু 'ন্যাশানালিজ্‌ম্' কথাটা অতি হালের সৃষ্টি; ওর বয়স একশ' বছরও নয়। অর্থাৎ এই গেল একশ' বছরের মধ্যে ইউরোপের 'নেশন' নামধেয় দলগুলি প্রতিদলের লোকের মধ্যে স্বার্থের একতা, আর দলে দলে স্বার্থের বিরোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ফসল ফলাতে এর চেয়ে সার মাটী আর নেই। এই নেশনে নেশনে যুদ্ধের আন্তরিকতা ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে প্রাচীন রাজায় রাজায় ঢিলে রকম যুদ্ধের কোনও তুলনাই হয় না। কেননা, এ যুদ্ধে অতি সহজেই এক নেশনের প্রত্যেক সৈন্যকে বিপক্ষ নেশনের প্রতি সৈনিকের প্রকৃত শত্রু করে' তোলা যায়, যে শত্রুতা কেবল হাতের নয়, মনের। আর এই শত্রুতা সাধনের যে সব অস্ত্র মানুষ এখন আবিষ্কার করেছে ও করবে বলে' ভরসা করছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু কোনও দিন মানুষের হাতে পূর্ব্বে ছিল না।

জানিনা আপনার কোনও পাঠক ওয়াশিংটন ও জেনোয়ার দিকে আমাকে তাকাতে বল্‌বেন কিনা। ওদিকে তাকিয়েছি এবং যাতে সব চেয়ে শঙ্কিত হয়েছি, সে ও দুই বৈঠকের নিষ্ফলতায় নয়, ওদের সফলতার আদর্শে। যে কাজের জন্য আটলাণ্টিকের দুই পারে ঐ

দু' জায়গায় 'নেশনদের' ডাকা হয়েছিল, তা অবশ্য সভ্য মানুষের সমাজ থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে নেবার উপায় উদ্ভাবন করা। কিন্তু তার মানে এ নয় পৃথিবীর সকল রকম দলের লোকের স্বার্থের একটা একতা ঘটান। যুদ্ধ রদের এই যে উপায় কল্পনা হয়েছে, তা হচ্ছে যে সব লোকের দল আধুনিক যুদ্ধ লড়বার ক্ষমতা রাখে, তাদের স্বার্থের বিরোধ মিটান। কেননা, এ সব দল মিলিয়ে যদি একটা বড় দল গড়া যায়, তবে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠে যাবার সম্ভাবনা আছে, কারণ দলের বাইরে যারা থাকবে, তারা সংখ্যায় বেশী হলেও স্বার্থ নিয়ে ওদলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তাদের নেই। বাঘে মেষে যে যুদ্ধ হয় না সে ত আপনি মনে করিয়েই দিয়েছেন। সুতরাং সহজেই এদের শান্ত রাখা চল্‌বে। আর তাদের একটু আধটু খাটিয়ে যদি মানুষের ধনসম্ভার কিছু বাড়ান যায়, তবে যোদ্ধাদলগুলির স্বার্থের বিরোধও অনেকটা মিটতে পারে। প্রাচীন এথেনীয় ডেমক্রেসির সাম্যের ভিত্তি যে ছিল দাস ও প্রভুর বৈষম্য এ ত সবাই জানি। মানুষের সমাজে যুদ্ধ আসার পূর্ব্বে ছিল পশুশিকার; 'লীগ অব্ নেশনে' যদি যুদ্ধ যায়, তবে পরে থাকবে মানুষ-শিকার। যারা 'নেশন' নয়, যাদের 'লীগও' নেই, তারা যদি এতে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানায় 'মানুষের সমাজে যুদ্ধ অক্ষয় হোক', অধর্ম্ম হলেও কি সেটা খুবই অন্যায় হবে?

'মানুষের সমাজে চিরদিন যুদ্ধ থাকবে' আর মানুষের সমাজ থেকে অল্পদিনেই যুদ্ধ যাবে' এর কোনটাই ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এ দুইই বর্ত্তমানের চেষ্টার লক্ষ্য। কোন লক্ষ্য মানুষকে কি রকম কাজে ব্রতী করে তাই নিয়েই ওদের বিচার। ভুল-শুদ্ধের মাপ-কাটিতে ওদের যাচাই করতে বসা নিরর্থক।

আমি স্পষ্ট দেখছি চিঠি শেষ হ'ল দেখে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন। আর আমার মনে ত আশা হচ্ছে, এর পর জবাব চেয়ে আপনার এ বন্ধুর নামে আর চিঠি বের করতে ভরসা পাবেন না। ইতি—

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

———

যুদ্ধের কথা

(প্রত্যুত্তর)

শ্রীযুক্তঅতুল চন্দ্র গুপ্ত ;—

সুহৃদবরেষু।

আপনি জানতে চেয়েছেন যে দেশে এত পণ্ডিত লোক থাক্‌তে, "যুদ্ধ থাক্‌বে কি যাবে", এ প্রশ্ন আমি আপনাকে কেন করেছি ; এর জবাব খুব সোজা। আমি জানতুম এ প্রশ্নের জবাব আপনার কাছ থেকে পাব আর কারও কাছ থেকে পাব না। আমি যে ঠিক অনুমান করেছিলুম তার প্রমাণ যুদ্ধের তরফ থেকে আপনার এই দীর্ঘ বর্ণনাপত্র।—

মানুষ যে পশুর দ্বিপদী সংস্করণ, এ কথা আপনি মানলেও, মানবধর্ম্ম যে পশুধর্ম্ম এ কথা আপনি মানেন না। আপনার এ মত শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। বিজ্ঞান আজকাল সব জিনিষেরই গোড়ার খবর বার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। Origin নিয়েই যে বিজ্ঞানের কারবার তার প্রমাণ পাবেন ডারউনের কেতাবের মলাটে। তিনি Origin of species না লিখলে মানবধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম, এক কিনা এ তর্ক উঠতই না। কিন্তু এই সব মুল তত্ত্বের একটা গোড়ায় গলদ আছে। "কিসের থেকে কি হয়েছে" আর "কি হয়েছে" এ দুই এক জিজ্ঞাসা নয়। ছেলেবেলায় স্কুল

স্ক্রেণ্ডদের মুখে শুনেছি যে সুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হয়। ধরে নিচ্ছি যে তাই হয়, তাহলেও ও দুটী জীবের রূপও এক নয় চরিত্রও এক নয়। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলতে আমরা সুঁয়োপোকার সম্বন্ধ বুঝি নে। কর্ত্তা কর্ম্মের জ্ঞান যে অপাদান উপাদানেরই জ্ঞান, এই উল্টোজ্ঞানের নামই বিজ্ঞান আর আমি যে nature এর নাম শুনতেই ডরাই তার কারণ nature আজ কাল এসেছে বিজ্ঞানের দখলে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে nature ও যেমন illogical বিজ্ঞানও তদ্রূপ। আপনি বিনয় করে বলেছেন যে আমি যে চৌদ্দ বিজ্ঞানের নাম করেছি তার একটির সঙ্গেও আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি উপরি চারিটি বিজ্ঞানের বিচার করেছেন, যথা archæology, embryology ; morphology ও palæontology। বিজ্ঞানের এই অষ্টাদশ পর্ব্ব ঘেঁটে আপনি যে তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন দেখা যাক্ তাতে আমার প্রশ্নের কতটা উত্তর পাওয়া গেল।

আপনার বক্তব্য এই যে মানুষ পশুর বংশধর কিন্তু পশু নয়, এ দুয়ের চেহারায় ঢের মিল থাকলেও, তাদের স্বভাবে তাদৃশ মিল নাই। এ কথা আমি মানি। evolution-এর প্রধান আচার্য্যেরা, যথা— Darwin, Spencer ইত্যাদি মুখাকৃতিতে অবিকল বানর, কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনে যে, আলিপুর চিড়িয়াখানার Ezra Houseয়ে বসে কোনও কপিরাজ Descent of Man কিম্বা Synthetic Philosophy লিখছে। ভাল কথা—William Butler প্রশ্ন করেছেন,—"কবি মাত্রেই সুন্দর হয় কেন, আর বৈজ্ঞানিক মাত্রেই কুৎসিত হয় কেন" ? এ প্রশ্নের উত্তর আমি করতে পারিনে, কেননা

আমি বৈজ্ঞানিক নই। Embryologyতে কি এর সন্ধান পাওয়া যাবে? তবে কবি মাত্রেই যে কন্দর্প, এ কথাও সত্য নয়। Wordsworth-এর মুখ ছিল ঠিক ঘোড়ার মত। তবে Wordsworth কবি ছিলেন কিনা, সে সন্দেহও অনেকে করে থাকেন।

এ তর্ক তোলায়, এ লেখার অবশ্য প্রকরণ-ভঙ্গ দোষ হল। কিন্তু কি করা যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করে Origin সম্বন্ধে কৌতূহল মানুষে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না; বিশেষতঃ যখন এ যুগের বিজ্ঞানের মহাপুরুষরা, "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণাঃ", আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এই মতকে সবাই মিলে মুখ ভেঙচাচ্ছেন।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক্। মানুষ পশু না হলেও, মানুষে মানুষে একটা মস্ত তফাৎ আছে। মানুষকে মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক সভ্য আর এক অসভ্য।

যতদূর আমরা জানি, মানুষ হাজার ছয়েক বছর হল সভ্য হয়েছে। তার আগে হাজার পঞ্চাশেক অথবা লাখ-পঞ্চাশেক বছর সে অসভ্য ছিল।

এক দলের বৈজ্ঞানিক বলেন যে, অসভ্য মানব যে যুদ্ধ করত, তার কোনও প্রমাণ নেই, আপনি এর উত্তরে বলেছেন যে, তারা যে যুদ্ধ করত না, তারও কোনও প্রমাণ নেই। অতএব অসভ্যকে ছুটি দেওয়া যাক। ওকে জেরা করে কিছু পাওয়া যাবে না। ও বেচারা নাবালক।

আপনি বলেছেন যে, সভ্য-মানব ওরফে ঐতিহাসিক মানব চিরদিন যুদ্ধ করে এসেছে, অতএব "এষঃ ধর্ম্ম সনাতন"। ইতিহাস যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে কিম্বা যুদ্ধ ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে, এ তর্ক আমি তুলছি নে;

কেননা ও দু' কথাই সত্য। যুদ্ধ যেমন ইতিহাসের মাল জুগিয়েছে, ইতিহাসও তেমনি যুদ্ধের মন জুগিয়েছে। আর এক কথা মানব-মন যেমন ইতিহাস গড়েছে, মানব-ইতিহাসও যে তেমনি মানব-মন গড়েছে, এই হচ্ছে ইভলিউসনের সিদ্ধান্ত। আপনি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর না দিলেও, ইঙ্গিতে বলেছেন যে, যুদ্ধ যখন অতীতে হয়ে এসেছে, তখন ভবিষ্যতেও হবে। কেননা, ওটি হচ্ছে ঐতিহাসিক মানবের বিশেষ ধর্ম্ম। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের কপালে যুদ্ধ লেখা আছে। আর অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে। fatalism তা naturalই হোক্ আর historicalই হোক্, দুইই fatalism। এস্থলে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, মানুষ কোনরূপ fatalism মেনে নিতে পারে না। কেননা, সে হচ্ছে আসলে spirit—আর spirit হচ্ছে স্বরাট, অর্থাৎ ভৌতিক কিম্বা ঐতিহাসিক কোনরূপ বিরাটের অধীন নয়। মানুষ প্রকৃতির দাস হয়ে জন্মাতে পারে—কিন্তু সে তার প্রভু হবে এই তার পণ। একথা অস্বীকার করলে Spiritকে অস্বীকার করতে হয়— অর্থাৎ জড়বাদী হতে হয়, আর তা যদি হই ত, উচিত অনুচিতের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জড়পদার্থের Science আছে, কিন্তু Conscience নেই। আর যে প্রশ্ন আমরা তুলেছি, সে Conscience-এর প্রশ্ন—Science-এর নয়। সুতরাং Conscience-এর দ্বিধা Science দূর করতে পারবে না, পারবে শুধু Conscience। আপনি লিখেছেন যে, আমার প্রতি কথার ভিতর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকে। একথা সত্য। কিন্তু সে বিদ্রূপ কিসের বিরুদ্ধে? প্রচ্ছন্ন জড়বাদের বিরুদ্ধে। আর দেশ যে আজ প্রচ্ছন্ন জড়বাদীতে ভরে গেছে, তার পরিচয়, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সাহিত্য,

কি পলিটিক্‌স্—সকল ক্ষেত্রে নিত্য পাওয়া যায়। আমাদের নব আধ্যাত্মিকতা যে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ, এ সত্য আমার বিশ্বাস আপনার দার্শনিক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বর্ণচোরা বস্তুর ভিতরের রূপটা যে কি, দেখতে হলে, তাকে চিরে দেখতে হয়। তাই আমার কলমকে আমি তুলি কর্‌তে চাইনে, ছুরি কর্‌তে চাই।

(২)

আপনি যুদ্ধের স্বপক্ষে যে ঐতিহাসিক Case খাড়া করেছেন, শেষটা একটা হৃদয়ের যুক্তি দিয়ে, আপনি নিজে হাতেই তাকে সমূলে ধ্বংশ করেছেন। তা যে করেছেন, তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

মানব সমাজ থেকে কালে যুদ্ধ দূরীভূত হবে কিনা এ প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন অর্থাৎ এটা একটা দার্শনিক প্রশ্ন।

কোন বিশেষ জাতির পক্ষে কোন বিশেষ অবস্থায় যুদ্ধ করা উচিত কি না, যথা ফ্রান্সের পক্ষে কাল রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত কি না এ হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রশ্ন অর্থাৎ practical প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের কোনরূপ দার্শনিক জবাব নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও রাসিয়ার উপস্থিত স্বার্থ ও পরস্পরের রাগদ্বেষের উপরই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে কোন বিশেষ জাতির বিশেষ স্বার্থ কিম্বা তার দ্বেষ হিংসা প্রবৃত্তির সাহায্যে ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না।

সুতরাং আপনি যখন বর্ত্তমানে ইউরোপের নিরস্ত্র হওয়াটা বাকী পৃথিবীর পক্ষে ভয়ের কথা কি না; এ প্রশ্ন তুলেছেন, তখন আপনি দার্শনিক সমস্যার, দিকে হঠাৎ একদম পিঠ ফিরিয়েছেন আর উক্ত প্রশ্নের উত্তরে যখন বলেছেন যে হাঁ ভয়ের কারণ তখন আপনার আগাগোড়া যুক্তিকে এক কথায়, ধূলিসাৎ করেছেন।

(৩)

যুদ্ধ কেউ সখ করে' করে না। আপনি বল্‌ছেন যে কর্ণ এ বিষয়ে একজন আর্টিস্ট ছিলেন, তিনি War for war's sake ই করতেন। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সাধারণ মানবের কোনও তুলনা হয় না। কর্ণ কবচ ধারণ করেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এ দেশের চাষাদের মুখে শুনেছি যে তাদের সমাজের কোন কোনও ছেলে হুঁকো হাতে করে ভূমিষ্ঠ হয়। সে সব ছেলেদের ধূমপানও যেমন কেউ বন্ধ করতে পারবে না, কর্ণের মত বীরের যুদ্ধ করাও কেউ বন্ধ কর্‌তে পারবে না। তবে পৃথিবীতে অদ্যাবধি একমাত্র কর্ণই সবর্ম্ম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বাদবাকী সকলে হন সচর্ম্ম।

সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে কর্ণ বাদ দিয়ে বাদবাকী লোক সখ করে যুদ্ধ করে না, একটা নয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করে। আর তার সে উদ্দেশ্য সফল হবে কি না, তা নির্ভর করে যুদ্ধে সে হারে কি জেতে তার উপর। যুদ্ধে জয়লাভ না হলে কোনও ফললাভ হয় না।

হয় আত্মরক্ষা নয় স্বার্থসিদ্ধিই হচ্ছে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এবং আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এত আমরা

সবাই মনে জানি, আর কেউ কেউ মুখেও মানি। তার উপায়টা নিয়েই যা তর্ক। এই কথাটা মনে রেখে এ বিষয়ের বিচার করা যাক।

(৪)

কোনও ব্যাপার পৃথিবীতে বহুকাল থেকে চলে আসছে বলে চিরকাল যে তাকে রাখ্‌তে হবে এ কথা কেউ বলে না। আপনার মুখেই শুনেছি যে থুকিদিদিসের ইতিহাসে প্লেগের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই পুরোণো দলীলের বলে, পৃথিবী থেকে প্লেগ তাড়ানোর চেষ্টা যে তার দখলী সত্ত্বের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা এ কথা আপনিও বলবেন না।

যখনি আমরা কোন বস্তুকে সনাতন বলি, তখন এই বলি যে সে বস্তু শুধু পুরাতন নয় তা স্থায়ী হওয়ায় উচিত। আমার যুবক বন্ধুটি যে যুদ্ধ পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হবার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার আসল কারণ ও কথা শুনে তাঁর ধর্ম্ম বুদ্ধিতে আঘাত লেগেছিল। কেননা যুদ্ধের প্রতি কোনরূপ দৈহিক টান তার ছিল না। দেহে সে যুবকটি ছিল; বালক ও বৃদ্ধের একটি অপূর্ব্ব মিলন।

যুদ্ধকে চিরকালই মানুষে একটা মহৎ অনুষ্ঠান বলে মনে করে এসেছে। এবং তার কারণও আছে।

যদি অনুমতি করেন ত যুদ্ধের স্বপক্ষে একটু ওকালতি করি। যুদ্ধের প্রসাদে মানুষের নানাদিকে নৈতিক উন্নতি হয়। এতে মানুষের সাহস বাড়ে, সংযম শিক্ষা হয়। স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-

বলিদান করতে সে অভ্যস্ত হয়। তারপর নেতাদের প্রতি ভক্তি, সহযোদ্ধার প্রতি সখ্য, স্বদলের সহিত ঐক্যজ্ঞান, এ সব মনোভাবও যোদ্ধার মনে জন্মাতে বাধ্য। এক কথায় বৈশ্যের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের চরিত্র মহৎ।

ব্যক্তি ছেড়ে জাতিতে আসা যাক, তাহলেও দেখতে পাব যে যে জাতিকে অপর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা কিম্বা স্বার্থসাধন করতে হয়, সে জাতিকেও ঐ সকল গুণ অর্জ্জন করতে হয় নচেৎ সে জাতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবে। নিরাপদে চিরজীবন খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার আদর্শ মানুষকে উন্নত করে না তাকে অবনত করে। এ সত্যের অন্ততঃ একটা অস্পষ্ট ধারণা সকলের মনেই আছে। তাই মানুষ যখনই ভোগসুখকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোন মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয় তখনই তার মুখের কথা যুদ্ধের পারিভাষিক শব্দ হয়ে উঠে।

(৫)

কাব্য ইতিহাসে যুদ্ধের যে এত গুণ কীর্ত্তন করা হয়েছে, তার মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা কোনও বিশেষ জাতির দিক থেকে দেখলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোনও রূপ নৈতিক আপত্তি হতে পারে না।

সমগ্র মানবের দিক থেকে দেখলেই আমাদের মনে যুদ্ধের সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। একের জিত অপরের হার। যেখানে আমরা দুপক্ষের কোনপক্ষই নই সেই

ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে একজাতির স্বার্থের জন্য অপর জাতির সর্ব্বনাশে বিশ্বমানবের কি স্বার্থ। একের হার আর অপরের জিতে যদি কাটাকাটি যায় ত সমগ্র মানবের হিসাবে যুদ্ধের ফল শূন্য। সুতরাং যুদ্ধ বজায় রাখতে হলে দেখাতেই হবে ওতে বিশ্বমানবের উন্নতি হয়। যিনি তা না দেখাতে পারবেন, তাঁকে যুদ্ধের মামলা সরাসরি ডিসমিস করতেই হবে।

যুদ্ধ যে মানবের উন্নতির সহায়, এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বক্ষ্যমান যুক্তি দেখান হয়েছে! যুদ্ধে যে জাত জেতে সে প্রবল, যে হারে সে দুর্ব্বল। এ ক্ষেত্রে বলের, অর্থ শুধু বাহুবল নয়; সেই সঙ্গে চরিত্র বল ও বুদ্ধিবল। এই তিনবলের একত্র সমাবেশ না হলে কোনও জাতি যুদ্ধে একাধিকবার জয়ী হতে পারে না। অতএব প্রবলের উন্নতির একটি উপায় হচ্ছে দুর্ব্বলের বিনাশ। এতে পৃথিবীতে প্রবল টেঁকে যায় আর দুর্ব্বল টেসে হয়। ধরুণ যদি ব্যাপার উল্টো হত, অর্থাৎ যুদ্ধে দুর্ব্বলের জয় হত, আর প্রবলের ধ্বংশ হত, তাহলে উত্তরোত্তর পৃথিবী দুর্ব্বল লোকেরই স্বর্গ হয়ে উঠত। ও পরিণতিতে কি সমাজিক কি আধ্যাত্মিক কোন হিসেবেই মানব সভ্যতার আদর্শ পরিণাম হত না। আমাদের শাস্ত্রে আছে, "দেবাঃ দুর্ব্বল ঘাতকা" আর উপনিষদ যে বলে "নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—তা যে প্রবাসী-পত্রিকার মলাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে সেই জানে। ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের পরীক্ষা পাস হয়েই মানুষকে তার চরম পদলাভ করতে হবে, আর তার ফলে মানুষ এই পৃথিবীতেই দেবত্ব লাভ করবে, অবশ্য দুর্ব্বলদের ইতিমধ্যে হয় বধ করে নয় তাদের দাস করে। অর্থাৎ দুর্ব্বলকে হয় মারা নয় তাকে প্রবলের পোষমানা—

জানোয়ার করাই হচ্ছে প্রবলের দেবত্ব লাভের একটি উপায়। অতীতে ঘটনা যে এই ভাবেই ঘটেছে, তাও স্বীকার্য্য।

(৬)

উক্ত মত যিনি না গ্রাহ্য না করেন তাঁর যুদ্ধের স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলবার নেই। অতএব তিনি এবিষয়ে একমাত্র sentimentalise-ই করতে পারেন। যুদ্ধ জিনিষটে ভাল, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে করা ভাল নয়, যেহেতু আমি দুর্ব্বল এরূপ কথার ভিতর যদি কোন লজিক থাকে ত সে হৃদয়ের লজিক, ইংরাজিতে যাকে বলে, pathetic fallacy. যুদ্ধের উকিলদের মুখে এ fallacy শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ না করলে, যে যুদ্ধ দর্শনে অধিকার জন্মায় না, এ কথাত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন।

আপনার পত্রের শেষাংশে আপনি দুর্ব্বলদের প্রতি দরদ দেখিয়েছেন। ইউরোপের নিরস্ত্র হওয়াটা আপনি ভয়ের কথাই মনে করেন। আপনি এই ভেবেই আকুল হয়েছেন যে ওদের যদি পরস্পরের মিল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের গতি কি হবে? প্রবলে প্রবলে যদি কাটাকাটি করে মরে তাহলেই দুর্ব্বলেরা দুনিয়াতে আরামে কাল কাটাতে পারে। এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু সঙ্গত নয়, বিগ্রহ মানেই হচ্ছে প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের নিগ্রহ। আপনি যখন দুর্ব্বলের পক্ষ তখন ধরে নিতে হবে, আপনি যুদ্ধের বিপক্ষ। যুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধ মেলালে পদ্য হতে পারে, কিন্তু

গন্ত হয় না, আর আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি, তার চেয়ে নির্ম্মম গন্ত পৃথিবীতে আর নেই।

আমি বলেছি যে আমি আশা করি পৃথিবীতে যুদ্ধ একদিন চিরদিনের জন্য চলে যাবে, কিন্তু তার থেকে মনে করবেন না, যে আমি এমন দিন দেখতে চাই, যখন মানব জীবনে বলের কোনও সার্থকতা থাকবে না। দুর্ব্বলের দুঃখে দুঃখী হওয়া খুব ভাল কথা, কিন্তু দুর্ব্বলতার প্রতি মায়া অতি সর্ব্বনেশে মনোভাব। ও মনোভাবের মানুষ যতই চর্চ্চা করবে, ততই সে অধঃপতিত হবে, যুগপৎ মনে ও চরিত্রে। যত দিন মানুষের দেহে প্রাণ বলে বস্তু থাকবে, ততদিন মানুষ শক্তির উপাসক থাকতে বাধ্য। কেননা প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও শক্তির স্ফূর্ত্তি একই জিনিষ।

(৭)

এ কথা বলায় আমি নিজের মত নিজেই খণ্ডন করছি নে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক।—সভ্য মানব অদ্যাবধি যে যুদ্ধ করে এসেছে এটাও যেমন একটা ঐতিহাসিক সত্য; মানুষের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ বলে গণ্য, তাঁরাও যে যুগে যুগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছেন, সেটাও তেমনি একটি ঐতিহাসিক সত্য।

তার ফলে, ধর্ম্ম যুদ্ধ, অধর্ম্ম যুদ্ধ, বৈধ হিংসা, অবৈধ হিংসা প্রভৃতি কথা সকল সভ্য জাতির মধ্যেই জন্মলাভ করেছে। যুদ্ধ যে অধর্ম্ম হতে পারে, অবৈধ হতে পারে সে কথা সভ্য মানব মাত্রেই মানে।

তারপর মানুষ হালে এ বিষয়েও সজ্ঞান হয়েছে যে শান্তির জীবন গড়ে তুলতে ও তার শারীরিক মানসিক সকল বলের একত্র

চর্চ্চার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। আর যে জাত শান্তির ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে, সে জাত যুদ্ধের সময়ও শক্তি ব্যয় করতে পারে না, কেননা সে শক্তির পুঁজি তার নেই। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে জাতি শান্তির জীবনে কৃতী হয় নি সে জাতি যুদ্ধেও কোনও কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। সুতরাং শান্তি যে দুর্ব্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত আর যুদ্ধ বলের উপর এ হচ্ছে গোঁয়ারের কথা। এক কথায় যুদ্ধ শান্তিরই বিকল্প মাত্র, যেমন সন্ন্যাস গার্হস্থ্যের বিকল্প। অতএব যুদ্ধ বন্ধ হলে যে মানুষ দুর্ব্বল ও জড়পদার্থ হয়ে পড়বে তার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, যুদ্ধ গত হলে ভবিষ্যতে মানব সমাজ রুগ্ন ও ভগ্নদের একটা পিঁজরাপোল হয়ে উঠবে।

(৮)

যুদ্ধের প্রতিবাদ যুগপৎ ন্যায়বুদ্ধির ও হৃদয়ের প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ অবশ্য তাদের মুখেই শোভা পায় যারা যুদ্ধ করে ও করতে পারে কেননা যুদ্ধ বন্ধ করতে যদি কেউ পারে ত তারাই পারবে। যুদ্ধ যারা করে না ও করতে পারে না, তারা যুদ্ধ চালাতেও পারবে না থামাতেও পারবে না। আপনার আমার মত ব্যক্তি এর দার্শনিক সমস্যার বিচার করতে পারে practical সমস্যার নয়।

কথাটা উঠেছে অবশ্য practical হিসাবে, আমরা কিন্তু দার্শনিক হিসাবে দেখতে চাইযে মানব শক্তির একটা গত্যন্তর হওয়া ভবিষ্যতে

সম্ভব কি না। শক্তি অবশ্যই থাক্‌বে কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রয়োগ হবে তাই নিয়েই ত এই তর্ক।

(৯)

যুদ্ধ চলে যাবে এরূপ আশা করা যে অসঙ্গত নয় সে বিষয়ে দু চার কথা বলে এই তর্ক যুদ্ধ শেষ করব।

আপনি যখন ইভলিউসান মানেন তখন আপনি conscience এর আভিব্যক্তিতে বিশ্বাস কর্‌তে বাধ্য। মানুষে ও পশুতে আসল প্রভেদ কোথায়। বুদ্ধি ও ন্যায়বুদ্ধি আমাদের আছে, পশুদের নেই। আর এ দুই বুদ্ধি মানুষের মনের লেজ নয় অর্থাৎ ওর দ্বারা তার শোভা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাজ হয় না এমন নয়। ইভলিউসান উভয়ের জন্ম দিয়েছে, একথা স্বীকার করলেও, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কর্‌তে হয় যে এই দুই বুদ্ধিই তার spiritual ইভলিউসনের প্রধান সহায়। সুতরাং মানুষের intelligence এবং conscience যদি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে, তাহলে জিত যে কার হবে সে কথা বলবার কি আর প্রয়োজন আছে?

আর আজকের দিনে, যে দেশে লোকে যুদ্ধ করে ও কর্‌তে পারে, অর্থাৎ ইউরোপে মানুষের conscience যে যুদ্ধের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ ইউরোপের সাহিত্যে নিত্যই পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের ঘা খেয়েই অবশ্য এ conscience সজাগ হয়েছে। মানব conscience চিরদিনই ঘা খেয়ে খেয়ে বেড়েছে। মানুষ যদি বিশ্বের আদুরে ছেলে হত, তার যদি কোনও দুঃখ কষ্ট না

থাক্‌ত ত ধর্ম্মজ্ঞান তার মনে কস্মিন কালেও জন্মাত না। মানুষ এ পৃথিবীতে যা শিখেছে তার বেশির ভাগ সে ঠেকে ও ঠকে শিখেছে, শুনে ও শুয়ে শেখেনি। সুতরাং এ আশা নির্ভয়ে করা যায় যে আজকের দিনের conscience এর প্রতিবাদের ক্ষীণস্বর ক্রমে এতটা প্রবল হয়ে উঠবে যে যুদ্ধের ঢাক ঢোলের গণ্ডগোলকে সে আওয়াজ ছাড়িয়ে উঠবে। আপনি দেহের ইভলিউসানে বিশ্বাস করেন, আমি উপরন্তু spirit এর ইভলিউসানেও বিশ্বাস করি, তাই বলে দুর্ব্বলতা আর spirit যে একই বস্তু এ ভুল আমি কখনই করি নি, নিজের মনকে স্তোক দেবার জন্যও নয়।

আর এক কথা। আপনি ঠিকই ধরেছেন, যুদ্ধের মূল—মানুষের বুকে নয়, তার পেটে। এ দেশে এ সত্য বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি অতি প্রাচীন গাথায় এ সত্য লিপিবদ্ধ আছে। "গাথাম চ ভাসতে"।

যস্যার্থে গহনে চরন্তি বিহগাঃ
গচ্ছন্তি বন্ধং মৃগাঃ।
সংগ্রামে শরশক্তিতোমর ধরা
নশ্যন্তি অজস্রং নরাঃ॥
দীনাদুর্দ্দিনচারিণশ্চ কৃপনা মৎস্যাঃ
গ্রসন্তি অয়সং।
অস্যার্থে উদরস্য পাপকলিলে দূরাৎ
ইহাভ্যাগত ইতি।
(দিব্যাবদান)

অতএব যুদ্ধের মূল পাওয়া যায় economics-এর ক্ষেত্রে। আর এ সত্য আপনার অবিদিত নেই যে ডারউইন তার struggle for existence-এর আইডিয়া, তৎসাময়িক ইংলণ্ডের economics-এর ক্ষেত্র হতে অজ্ঞাতসারে চুরি করে Biology'র ক্ষেত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ও আইডিয়া হচ্ছে economics যাকে competition বলে, তারি বায়লজিকাল অনুবাদ।

এখন আমার বক্তব্য এই যে ইকনমিকসে যদি competition এর বদলে co-operation আসে, তাহলে যুদ্ধের মূল নির্ম্মূল হবে।

আর আজকের দিনে যখন প্রতি জাতি তার নিজের সমাজে co-operation আনতে চেষ্টা করছে, তখন ভবিষ্যতে মানব সমাজে যে জাতিতে জাতিকে co-operation হবে—এরূপ আশা করা—sentimentalism নয়, আর তার উল্টো মতই যে sentimentalism, তা আপনি অবশ্য মানবেন।

বীরবল

২৯শে মে, ১৯২২।

পুনশ্চ,

যুদ্ধ বন্ধ করবার একটা সহজ উপায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। দুনিয়ার লোককে যদি দার্শনিক করে' তোলা যায়, তাহলে তাদের যুদ্ধের সাধ তর্কে মিটতে পারে। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন, কেননা মানুষকে তার্কিক করে' তোলার কাজে, আপনি আর আমি দুজনেই যে হাত লাগাতে পারি, তার প্রমাণ আমাদের এই চিঠিপত্র।

জুলি রোমেন।

(Manpassant-র ফরাসী হইতে)

বছর দুই আগে একবার বসন্তকালে মেডিটারেনিয়ানের তীর ধরে পায়ে হেঁটে ইটালীর দিকে যাচ্ছিলেম। জোরে পা ফেলে চলছি, মনে কত কথার না উদয় হচ্ছে, কত স্ফূর্ত্তিই না বোধ করছি। চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত আলো, গায়ে ঝির ঝির করে হাওয়া লাগছে,—পাহাড়ের গা বেয়ে, সমুদ্রের তীর দিয়ে চলেছি। স্বপ্নপুরীর দোর বুঝি খুলে গেছে! কত অবাস্তব সুখের কথা, কত ভালবাসার—স্বপ্ন, কত কীর্ত্তি-কাহিনী সেই ছুটি-পাওয়া মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে! মানুষের প্রাণের লক্ষ অর্দ্ধোস্ফুট আশা, উল্লাসের ঢেউ তুলে চোখের সুমুখে নেচে বেড়াচ্ছে! সেই খোলা বাতাসে তাদের দীপ্তকান্তি নিয়ে তারা ভিতরে ঢুকে পড়ে, হাঁটবার পরিশ্রমের দরুণ শরীরের ক্ষিদের সাথে সাথে মনেও সুখের ক্ষিদে জাগিয়ে তুলেছে। একটার পর একটা করে কত সুখের চিন্তাই না মনে আসছে,—আর পাখীর মত সুর তুলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সেঁইত-রাফেল থেকে যে পথ ইটালী মুখে গিয়েছে, সেই পথ বেয়ে আমি চলছিলেম;—আর কি সেই পথ! পৃথিবীতে প্রেমিক কবিরা যত প্রণয়-স্বপ্ন, কাব্যে প্রকাশ করেছেন সে গুলোকে বাস্তব করে তোলবার জন্যই বুঝি সেই পথের দু'ধারে প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে! এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হল যে

সুনীল, সুন্দর আকাশের তলে গোলাপ ও নেবু ফুলের গন্ধে ভরা কানেস থেকে মনাকো পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য দেশে মানুষ আসে কিনা, কেবল টাকার জাঁক দেখাতে, কারবার করতে, গোলযোগসৃষ্টি করতে, তার অহমিকা, দাম্ভিকতা ও লোভের ঘৃনিত পসরা সাজাতে,—মূর্খ, উদ্ধত, লোভী ও হীন মনুষ্য-চরিত্রের নগ্ন কদর্য্যতার পরিচয় দিতে।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই নজর পড়ল একটা পথের মোড়ে গুটিকতক ভিলা, চারটে কি পাঁচটা হবে—পাহাড়ের গোড়ায়, একেবারে সমুদ্রের ধারে। তাদের পিছনে দুটো উপত্যকা—পথ ঘাট বিহীন দুর্গম দেবদারু বনে আচ্ছন্ন। এদের মধ্যে একটা ভিলার সুমুখে আমার পা দু'টো মুগ্ধ মনের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধগতি হয়ে হঠাৎ থেমে গেল—এত তার সৌন্দর্য্য! ছোট একটা শাদা বাড়ী, ভিতরে লাল্‌চে রঙের কাজ, ছাদ পর্য্যন্ত তার গোলাপের লতা বেয়ে উঠেছে।

আর সে বাড়ীর বাগান!—তার শোভা বাড়াবার জন্য এলো-মেলো ভাবে মিশিয়ে পোঁতা ফুলগাছে সব রকম রঙ ও চেহারার ফুল ফুটে বাগানখানিকে ঢেকে দিয়েছে। ছোট লেনটুকু ঘাসে সবুজ; সিঁড়ির প্রতি ধাপের কোণে গাছের টব; প্রতি জালনার সুমুখে স্তবকে স্তবকে নীল বা হলদে আঙ্গুর, লতাশুদ্ধ হেলে পড়েছে; পাথরের রেলিং দেওয়া ছাদের চারদিক রক্তবর্ণ বড় বড় বেল ফুলের লতা, মালার মত করে ঘিরে রেখেছে।

বাড়ীর পিছনে সার বাঁধা ফুল-ভরা কমলার গাছ, পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

দুয়োরের উপর ছোট সোনালী হরফে বাটীর নাম লেখা—ভিলা—স্থ জঁতা।

আমি ভাবলেম কে এই কবি বা পরী কিংবা বিলাসী বনবাসী যে এই জায়গা আবিষ্কার করে স্বপ্নের মত সুন্দর এই আশ্রম সৃষ্টি করছে, যা এক স্তবক ফুলের মতই শোভা করে আছে।

একজন লোক একটু দূরে বসে রাস্তা তৈয়েরীর পাথর ভাঙ্গছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—এ পরী-আবাসের মালিক কে? সে বলল,—মাদাম জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন! অনেক কাল আগে, আমার ছেলেবেলায়, বিখ্যাত অভিনেত্রী, রাচেলের প্রতিদ্বন্দী জুলি রোমেনের সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনেছি।

আর কোন রমণীও এত সুখ্যাতি ও এত ভালবাসা,—বিশেষ করে এত ভালবাসা কখনো পায় নি! তার জন্য কত ডুয়েল, কত আত্মহত্যা, কত আশ্চর্য্য কাণ্ডই না হয়ে গিয়েছে। এ রমণীর বয়স এখন কত হবে?—ষাট, সত্তর, না পঁচাত্তর? জুলি রোমেন! এখানে? এই বাড়ীতে, সেই স্ত্রীলোক থাকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য ও শ্রেষ্ঠ কবি যাঁকে পূজো করেছেন?

এখনও আমার মনে পড়ে সমস্ত ফ্রান্সব্যাপী সে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল (তখন আমার বয়েস বার বছর) যখন এক সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদের পর সে এক কবির সাথে পালিয়ে সিসিলীতে চলে যায়।

সে যায় একদিন রাত্রে, রঙ্গমঞ্চে একদফা অভিনয় সেরে। দর্শকেরা সে রাত্রে আধ ঘণ্টা ধরে হাততালি দিয়েছিল, এগার বার তাকে ফিরে ডেকেছিল। কবির সঙ্গে সেকালে প্রচলিত ঘোড়ার ডাক গাড়ী করে সে চলে যায়। তারপর সাগর পেরিয়ে, তাদের

প্রেমকে নিবিড় ও সুন্দর করে তোলবার জন্য গ্রীস-দুহিতা সেই প্রাচীন দ্বীপে উপস্থিত হয়। যেখানে কমলার বন সমস্ত পালারমো ঘিরে রেখেছে, আর লোকে যার নাম দিয়েছে—"সোনার সাঁঝ"।

সকলে গল্প করত যে, তারা দুজনে গালে গাল দিয়ে, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে এমনি করে' এটনার উপর উঠে তার গহ্বরের মুখে ঝুলে থাকত, যেন অগ্নিময় গহ্বর গর্ভে এ অবস্থাতে তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

তারপর সে কবি মারা যায়। একটা যুগ ধরে লোকে তার কবিতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এতই ভাব সম্পদ পূর্ণ ছিল তার কাব্যসৃষ্টি। সে কাব্য এতই সুন্দর, এতই গভীর যে, নূতন কবিদের চোখের সুমুখে সে একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি যা একটা সম্পূর্ণ নূতন জগতের দ্বার খুলে দেয়।

যাকে সে ত্যাগ করেছিল, সেও বাঁচে নি—প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করে যে গীত সে গেয়েছিল, এখনও তার স্মৃতি লোকের মনে মোহ সঞ্চার করে, আশা নিরাশায় উচ্ছ্বসিত, আবেগে ও মর্ম্মবেদনায় কম্পিত কি সে অপূর্ব্ব গীত।

আর কেবল সেই স্ত্রীলোক ছিল এ পর্য্যন্ত বেঁচে, ফুলের ঘোমটা ঢাকা ছোট এই গৃহখানিতে। ইতঃস্তত না করে আমি দুয়োরের কড়া ধরে নাড়লেম।

বেকুব ও অসভ্য গোছের চেহারার একটি বছর আঠারোর ছোকরা দুয়োর খুলে দিল। আমি কার্ডের উপর বৃদ্ধা অভিনেত্রীর উদ্দেশে দু'একটা প্রশংসা বাক্য লিখে ও তার সঙ্গে দেখা করবার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়ে দিলেম। হয়ত আমার নাম জানলে দেখা করতে আপত্তি নাও করতে পারে।

ছোকরা চাকরটা চলে গেল, তারপর ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা সালোনে নিয়ে গিয়ে বসাল, ঘরটা অতি পরিপাটী করে, লুই ফিলিপের আমলের ষ্টাইলে সাজানো,—তেমনি সব ভারি ভারি পাথরের মূর্ত্তি দিয়ে। বছর ষোল বয়েসের বেঁটে সুন্দরী একটি ঝি, আমার সম্মানের জন্য সে মূর্ত্তিগুলোর ঘেরাটোপ তুলে দিয়ে গেল।

আমি একাই বসে রইলেম। দেয়ালে দেখলেম তিনখানা চিত্র রয়েছে। একখানা নাটকীয় সজ্জায় সেই অভিনেত্রীর, দ্বিতীয়খানা কবির, রাইডিং কোট ও ফ্রিল দেওয়া কামিজ গায়ে, তৃতীয়খানা গায়কের, একটা হার্পিসকর্ডের সুমুখে বসে। সেই সাবেক কালের পোষাকে সজ্জিত হয়ে অভিনেত্রী তার নতনেত্রে ও মিষ্ট মুখে মধুর হাসি নিয়ে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিগুলো সব সযত্নে অঙ্কিত, সুন্দর, পরিপাটি ও নীরস।

সেগুলো দেখে মনে হয় ভবিষ্যতের দিকে তারা যেন চেয়ে রয়েছে।

চারদিকের জিনিষ গুলোর চেহারাও গত যুগের,—যেদিন গত হয়েছে তাই নিয়ে, যে সব মানুষ বেঁচে নাই তাদের নিয়ে।

একটা দরজা খুলে গেল, একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল, দেখতে সে বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা, অতি খাটো—মাথা সাদা চুলে ভরা, সাদা ভুরু—

এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরল, তারপর তরুণ, মধুর, সতেজ কণ্ঠে বলল, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যসে; আজ কালকের পুরুষেরা যে আমার মত রমণীদের কথা মনে রাখে সেটা সৌভাগ্যের বিষয় বটে। বসুন, বসুন।

আমি তাকে বললেম, আমি তাঁর বাড়ী দেখে মুগ্ধ হয়ে মালিকের নাম জানতে চাই ; তারপর নাম জানতে পেরে দুয়োরে ধাক্কা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

সে বল্‌ল—এবাড়ীতে এরকমের অতিথির সাক্ষাৎ এই প্রথম বলে আমার আনন্দের সীমা নেই। যখন প্রশংসা বাক্যে পুর্ণ আপনার কার্ড খানি হাতে এল, আমি ফেঁপে উঠলেম, মনে হল কুড়ি বছরের হারাণো কোন বন্ধুর বার্ত্তা বুঝি ফিরে পেলেম। আমি ত মৃত ব্যক্তির মতই, কারো স্মৃতিতে, কারো চিন্তায় আমার স্থান নেই। তারপর এরিমধ্যেই একদিন সত্য সত্য যখন মরব,—তখন দেশের সব কাগজ গুলো দিন তিনেক ধরে জুলি রোমেনের কথা বলবে, দু' একটা গল্প, কথাবার্ত্তা, একটু স্মৃতিকথা, দু'চারটে আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসা ছাপা হবে। তারপর আমার আপনার বলতে যা কিছু সব শেষ হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে সে ফের বললে,—এই শেষ হবার আর বেশী দেরী নেই। হয়ত কয়েকটা মাস, কয়েকটা দিন পরে এখনোও জীবিত এই ক্ষুদ্রকায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির থাকবার মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র একটি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

সে তার দুটি চোখ তার নিজের চিত্রের দিকে তুলে ধরল,—সেটা তার দিকে,—তার বর্ত্তমান জরা জীর্ণ রূপহীনতার দিকে, চেয়েই যেন মৃদুহাসি হাসছিল, তারপর আর দুটি চিত্রের উপর গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ল, পর্ব্বিত কবির ও ভাবোন্মত্ত গায়কের। তারা যেন তার দিকে চেয়ে বলছে,—

এখন একে কে চায় ?

হঠাৎ আমার সমস্ত মন একটা প্রবল, তীব্র, অব্যক্ত বিষাদে

বিকল হয়ে গেল। জীবনে যার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তার বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা গভীর বিষাদময় ; তাই আমার হৃদয়কে সে বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। গভীর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে চায়, এমন কাজ-ফুরাণো জীবনও তেমনি করেই সমাজের মনে নিজের স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখতে প্রয়াস পায়।

যেখানে বসেছিলেম সেখান থেকে দেখলেম কয়েকখানা জমকালো গাড়ী দ্রুতবেগে নিস থেকে মনাকোর পথে চলে গেল। গাড়ীর ভিতরে কয়েকটি রূপবতী, যুবতী রমণী, যাদের পয়সা ও সুখ সৌভাগ্য দুইই—আছে— এবং কয়েকটি পুরুষ -হাসি মুখ ও খুসি মন। সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখল। দেখে, আমার মনের ভাব বুঝে একটুখানি উদাস ভাবে হেসে বলল,—

আগে যেমন ছিল কেউ আর কি তেমন হতে পারে ?

আমি বললেম—আপনার জীবন কত সুখেরই না ছিল ?

সে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,— খুব সুখের, খুব সুন্দর। তাইত আমার এত আপশোষ।

আমি দেখলেম নিজের জীবনের কথা বলতে তার ইচ্ছা আছে। ব্যথার জায়গায় লোকে যেমন সন্তর্পণে হাত দেয়, তেমনি সাবধানে আমি তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেম।

তার সফলতার গল্প, তার কালের, তার বন্ধু বান্ধবের, তার বিজয় গৌরব মণ্ডিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস, সে বলতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলেম,

আপনার জীবনের বেশীর ভাগ আনন্দ, প্রকৃত সুখ—নিশ্চয় থিয়েটার থেকেই আপনি পেয়েছেন ?

—মোটেই না।

আমি হাসলেম, চিত্র দুখানির দিকে একটু বিষাদের দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল,

—ঐ দুইজনের কাছ থেকে,

আমি না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারলেম না,

—দুজনের কোনটি?

দু'জনই। এ বৃদ্ধ বয়সে ওদের দু'জনকে এক করেই আমি ভাবি। এতদিন পরে যেন ওদের একটির সাথে আমার ব্যবহারের জন্য একটু অনুতাপের মত বোধ করছি।

—তাহলে বলুন—ঐ দুজন নয়, প্রেমের দেবতা স্বয়ং আপনার কৃতজ্ঞতার দাবী করতে পারেন,—ওঁরা দুজন সে দেবতার পুরোহিত মাত্র।

—সম্ভব। কিন্তু কি দরের পুরোহিত!

—আচ্ছা আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে আপনি কি ঠিক সমান, হয়ত বেশী, ভালবাসা পেতেন না, যদি ওঁদের পরিবর্ত্তে কোন কোন সাধারণ পুরুষ, যার কোন খ্যাতি নেই, যে সমস্তজীবন, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন, সমস্ত সময়, তার যা কিছু সমস্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করত—যেখানে ওঁরা দুজন আপনাকে কেবল প্রেমের দুটি বিষম প্রতিদ্বন্দী—সঙ্গীত ও কাব্য—এই দুটির মধ্যে টেনে এনেছিলেন?

সে উচ্চস্বরে, তার তখনো তরুণ কণ্ঠে, আবেগ ভরে বললে—

—না মঁসিও, কখনো না। আরেক জন হয়ত আমাকে বেশী ভালবাসত, কিন্তু ওদের মত করে ভালবাসতে পারত না। আমার জন্য প্রেমের সঙ্গীত যেমন করে তারা গেয়েছে, পৃথিবীতে

আর কেউ তেমন করে গাইতে পারত না। কেমন করে আমাকে মাতিয়ে তুলত তারা! কোন লোক'—বলুন ত পৃথিবীতে আর কোন লোক শব্দ ও কথার ভিতর থেকে, যা তারা বের করছে, তা বের করতে পারত? স্বর্গ মর্ত্ত্যের সব কাব্য, সব সঙ্গীত যে প্রেমকে মহিমাময় করে তোলে নি, সে প্রেম কি করে সম্পূর্ণ হবে? তারা জানত কি করে শুধু কথা ও শব্দের সাহায্য নারীকে পাগল করে তোলা যায়? হয়ত আমাদের ভালবাসার ভিতরে নিছক রক্ত মাংসের টানের চাইতে কল্পনার মোহ ছিল বেশী, কিন্তু রক্ত মাংসের টান যেখানে এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের ফেলে রাখে, এই মোহ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের রাজ্যে। অপরে হয়ত আমাকে বেশী ভালবেসেছে, কিন্তু তাদের দিয়েই আমি প্রেমকে বুঝতে, অনুভব করতে, পূজো করতে শিখেছি।

হঠাৎ সে কেঁদে ফেললে।

নিরাশার বুক ভাঙ্গা কান্না সে—শব্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই!

দূরের দিকে চেয়ে, মুখ ফিরিয়ে কিছুই যেন দেখছিনে আমি এই ভাব দেখালেম। একটু বাদে সে ফের বললে,—

আপনি ত জানেন মঁসিও সকল মানুষের দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও বুড়ো হয়। আমার বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমার দেহটার বয়েস হয়েছে ঊণসত্তর বছর, আমার মনের বয়েস রয়েছে কুড়ি, সেই জন্যই একা একা এই ফুল পাতা আর স্বপ্ন নিয়ে ... ...

কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকলেম। সে সুস্থির হয়ে, মৃদু হাসি হেসে বলতে লাগল,—

—আপনি যদি আমার সব কথা জানতেন তাহলে নিশ্চয় ঠাট্টা করতেন—যদি জানতেন কি করে সন্ধ্যাবেলাটা আমি কাটাই—যখন আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। আমি সে কথা ভেবে নিজেই নিজের জন্য লজ্জা ও করুণা বোধ করি।

আমি তাকে অনেক অনুরোধ করলেম, সে তা কিছুতেই বলতে চাইল না কি করে সে সময়টা তার কাটে? তারপর বিদায় নেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালেম।

সে বলে উঠল, এর মধ্যেই?

আমি যখন বললেম যে মণ্ট-কারলোতে আমার ডিনারের অর্ডার আছে, সে ইতস্ততঃ করে বলল,—

—আপনি আমার এখানে ডিনার খাবেন না কি? খেলে বড় খুসী হব।

বিনা আপত্তিতে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেম। সে পরম আহ্লাদিত হয়ে ঘণ্টা বাজালে। তারপর ঝিকে গোটা কয়েক আদেশ দিয়ে বাড়ীটা দেখবার জন্য আমাকে নিয়ে চল্‌ল।

খাবার ঘরের সম্মুখে গাছের টব ভরা, কাঁচে-ঘেরা একটা বারন্দার মত জায়গা—সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাড়ীর পিছনে, পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত কমলা গাছের সার চলেছে। তাদের মধ্যে একখানা নীচু বেঞ্চ,—দেখলেই বোঝা যায় যে বৃদ্ধা অভিনেত্রী প্রায়ই সেটার উপর বসত।

তারপর ফুল পাতা দেখবার জন্য আমরা বাগানে ঢুকলেম। অতিধীরে তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমরা যখন ডিনারে বসলেম, তখনো আলোর রেখা আকাশে একেবারে মুছে যায় নি।

ডিনারের যোগাড় মন্দ ছিল না, অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চলল। গল্পে গল্পে সে ও আমি—দু'জনে পুরোণো বন্ধুর মত হয়ে উঠলেম, যখন সে বুঝতে পা'রল, তার কাহিনীতে কি গভীর সহানুভূতি আমার প্রাণে জেগে উঠেছে, তখন দুই চুমুক ক্লারেট খাবার পর সে দিল-খোলসা হয়ে উঠল—তার আলাপ জমে উঠল।

সে বলল,—আসুন, একবার চাঁদ দেখা যাক্। আমি চাঁদের আলো বড় ভালবাসি। চাঁদ আমার জীবনের পরম সুখের সময়-গুলোর সাক্ষী। আমার মনে হয় কি জানেন,—সে গুলোর সমস্ত নিদর্শন আমার অন্তরেই রয়েছে, একটু চিন্তা করলেই আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাই। হয়ত ... ... কখন সন্ধ্যাবেলায় ... ... নিজে নিজে একটা চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করি ... ... ভারি চমৎকার দৃশ্য ... ... যদি আপনি জানতেন? না,—জানলে নিশ্চয় আমাকে ঠাট্টা করতেন ... ... সেটা বলতে পারিনে ... ... আমি সাহস পাইনে ... ... মোটেই সাহস পাইনে।

আমি মিনতি করে বললেম,—

—কি দৃশ্য আমাকে বলবেন না? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ঠাট্টা করব না—শপথ করছি, বলুন।

সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমি নিজের হাতে তার হাত দুটো নিলেম—তার সেই একটুখানি, শীর্ণ, শীতল দু'টো হাত ধরে, সেকালের প্রথামত সে দু'টো হাত চুম্বন করলেম। তাতে সে বিচলিত হল। তখনো সে ইতস্তত করতে লাগল,—

—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে হাসবেন না—

—আমি শপথ করে বলছি।

—আচ্ছা, আসুন।

সে উঠে দাঁড়াল। সেই বেকুব চেহারার বেঁটে চাকরটা তার পিছন থেকে চেয়ারখানা সরিয়ে নিলে, সে তার কানে কানে খুব আস্তে ও খুব দ্রুত কয়েকটা কথা বল্‌লে। চাকরটা বললে,—

—হাঁ মাদাম, এখনই।

তারপর আমরা দু'জন বারান্দার নীচে নেমে এলেম।

কি চমৎকার দেখতে সেই পথ,—দু' ধারে কমলা গাছের সার! মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ তখন আলো ঢেলে দিচ্ছে,—ছায়ার মত স্তব্ধ, অস্পষ্ট চেহারার গাছগুলোর মাঝে হল্‌দে রংয়ের বালির উপর জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রেখা পড়ে মাঝের পথটি দেখাচ্ছে—যেন রূপো-বাঁধান।

গাছগুলোর গায়ে ফোটা ফুলের সাজ, চারদিক মিষ্ট গন্ধে ভরপুর। কালো কালো ডাল পাতার মধ্যে হাজার হাজার জোনাকী ও আলো-পোকা, তারার টুকরোর মত ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমি উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেম,—বাঃ! প্রেমের উপযুক্ত লীলা ক্ষেত্র এমন আর হয় না!

সে হাসল,—

—তাই নয় কি? এখনই দেখবেন।

সে বসে, তার পাশে আমাকে বসাল।

তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল,—চারিদিকে যে সব দেখছেন, এ গুলোই আমার মনে, জীবনের জন্য আপশোষ আনে। আপনারা, অর্থাৎ আজকালকের লোক যারা, এ গুলোর কথা ভাবেন কিনা সন্দেহ। আপনারা কেবল টাকার পিছনে ফেরেন—কেউ ব্যবসায়ী,

কেউ মামলাবাজ, এই সব। আমাদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়, তা পর্য্যন্ত আপনারা জানেন না,—আমাদের অর্থ তরুণীদের। আজকালকের ভালবাসা এসে দাঁড়িয়েছে, অবৈধ সম্পর্কে (liasion), তার আরম্ভ হয়ত অখ্যাতনামা কোন নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বেনামী প্রণয়-পত্রে। যদি ঐ পত্রটাকে ঐ মেয়েটির চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন, তবে ঐখানেই খতম, আর তার দাম যদি বেশী মনে হয়, তবে দেও পয়সা। আহা! কি চমৎকার নীতি, কি চমৎকার ভালবাসা!

তারপর আমার হাত ধরে বলল,—

—ঐ দেখুন—

আমি উল্লসিত, বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে গেলেম। ঐ সরু পথের মোড়ে, চাঁদের আলোয়, মাথায় প্রায় সমান দুটি মূর্ত্তি ধীরে আসছে। অতি ধীরে পা ফেলে, হাত ধরে, মোহন বেশে তারা এগোচ্ছে, পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো তাদের উপর পড়ে একবার দু'জনকে উজ্জ্বল করে তুলছে, এগিয়ে আসতে আসতে আবার তারা অন্ধকারে ঢুকছে। পুরুষটির পরণে, গত যুগের ফ্যাসনে শাদা সাটিনের পোষাক, মাথার টুপীতে অষ্ট্রীসের পালক। রমণীর পরণে, রীজেন্সী আমলের ফ্যাশনে মহিলাদের মত হুপ-পেটি-কোর্ট ও মাথায় পাউডার মাখা চুল।

আমাদের কাছ থেকে একশ' হাত দূরে তারা থেমে গেল, তারপর পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

হঠাৎ চিনতে পারলেম—ঐ দু'জন আর কেউ নয়, ঐ বাড়ীর সেই চাকর আর ঝি। অদম্য হাসির উচ্ছ্বাসে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হল। কিন্তু আমি হাসলেম না। অতি কষ্টে, বহু চেষ্টায় হাসি

চাপতে লাগলেম—কোনো মানুষের একখানা পা কেটে দিলে, সে যেমন করে কাঁদবার জন্য হা করেও কান্না চাপতে চায় তেমনি করে।

দু'জন পথের ওদিকটা বনের ভিতর ফিরে গেল—তখন দেখতে আবার তাদের তেমনি সুন্দর বলে মনে হল। ধীরে ধীরে তারা পিছিয়ে যেতে লাগল, তারপর স্বপ্ন-দৃষ্ট একটা সুন্দর দৃশ্যের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারা ফিরিল না,—খালি সরু পথটা একেবারে ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

তারপর আমি উঠে বিদায় হলেম, বিদায় হলেম এইজন্য যে সে দুজনকে যেন আর না দেখতে হয়। ভাবলেম যে-দৃশ্য এইমাত্র দেখলেম বহুকাল সেটা মনে থাকবে। ঐ দৃশ্য একবার দেখামাত্রই সেই বৃদ্ধ অভিনেত্রীর সমস্ত গত জীবন, তার ভালবাসা, তার ভোগ, সমস্ত অতীত যুগ,—তার বিকৃত রুচি, তার মোহ, তার সৌন্দর্য্য, তার প্রবল সম্মোহন নিয়ে, আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল,—আর টের পেলেম, কেমন উজ্জ্বল হয়ে সেগুলো ঐ বৃদ্ধা অভিনেত্রী ও প্রেমিকার মনে বেঁচে রয়েছে।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

৮ই জুন, ১৯২২।

গৃহ-লক্ষ্মী

—:০:—

এ দেশের নারীকে যিনি সর্ব্বপ্রথম গৃহ-লক্ষ্মী এই আখ্যাটী দান করেছিলেন তিনি যে কবি নন শাস্ত্রকার, তা একরকম নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা কবির কথা সকলে সমান ভাবে মানে না, কিন্তু নির্ব্বিচারে শাস্ত্র বাক্য মেনে-চলার এই দেশে আবাল বৃদ্ধ সবাই যে এক বাক্যে নারী কূলকে গৃহলক্ষ্মী বলে, এ কথা কে না জানে। কবির বিস্ময়ভরা ধ্যানের চোখে যিনি হলেন চঞ্চলা কমলবন বিহারিণী, শাস্ত্রকার তাঁর সেই চঞ্চলপদকে খোঁড়া করে, আগে তার একটী বাহন দিলেন আলোতরাসী পেঁচা লক্ষ্মী, তারপর অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুগৃহে সেই খোঁড়া লক্ষ্মীকে আবদ্ধ করে পরম নিশ্চিন্ত হলেন। স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রকারদের আস্থা যে খুব বেশী তার পরিচয় তো, "স্ত্রীয়াঃশূদ্রাঃ" বলে নারীকে শূদ্রের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানোতেই পাওয়া যায়। তাই এ দেশের শাস্ত্রবাহক জ্ঞানীগণ খাঁচার পাখী হিন্দু মহিলাকে মুখে যখন গৃহলক্ষ্মী বলে গর্ব্ব করেন মনে মনে তখন তাঁরা সবাই বোঝেন যে, ও পদটির অর্থ গৃহরক্ষী মাত্র, তার একবর্ণও বেশী নয়।

অনেকে হয়ত জোরগলায় বলে উঠবেন—কেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" এও তো আমাদেরি শাস্ত্রকারদের কথা। ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা চাই যে, "যারে বলি ভালবাসা তারে বলি পূজা" এটা হচ্চে কবির কথা। শাস্ত্রকার যাকে পূজা বলেছেন, তা এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাণহীন প্রতিমারই

হয়, সে পূজায় যদি কিছু ফললাভ হয় তো সে এক পূজারীরই চিত্ত বিনোদন, প্রতিমা শুধু মণ্ডপের শোভা মাত্র।

তারপর এই সব পরস্পর-বিরোধী শ্লোক বচনের ছঁড়াছড়িতে এইটেই প্রতিপন্ন হয় যে, যাদের বিষয় নিয়ে এই সব রচিত তাদের নিজেদের কোন কথাই বলবার অধিকার না দিয়ে, নানান মুনি খেয়াল মতন নানান মত প্রচার করে গিয়েছেন মাত্র। তাতে করে নারীর অধিকার তো দূরের কথা তাদের স্বাভাবিক মর্য্যাদাজ্ঞান পর্য্যন্ত এক তিল বাড়ানো হয় নাই। তাই আজ দেখ্‌তে পাই হিন্দুঘরের ভক্তিমতি গৃহিণীগণ পূজা পার্ব্বণের দিনে নিরম্বু উপবাসী থেকে যে ষোড়শোপচার ভোগ রান্না করেন, সেটাকে নিজের হাতে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর্‌বার অধিকার পর্য্যন্ত তাদের নেই। তাই যেখানে একাদশী তত্ত্ব বলে—ষাট পেরুলে নির্জ্জলা উপোস অবিধি সেখানে শাস্ত্রী-সমাজের পুঁথির পাতায় অশীতিপরা বৃদ্ধা অশক্ত বিধবার পক্ষেও তৃষ্ণায় বুকফাটা বোশেখী রোদের দিনেও নিরম্বু একাদশী পালনই অকাট্য বিধান।

সেদিন হিন্দুশাস্ত্রের উদারতা নিয়ে পরম গর্ব্বকারী দলের এক ব্যক্তির বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখি,—বৃদ্ধামাতা হবিষ্যান্নের ভোগ প্রস্তুত করে পূজার আয়োজন সাজিয়ে নিয়ে—পাহারা দিচ্ছেন। বেলা হেলে পড়েছে, তবু তাঁর অনাহারে তদবস্থায় বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো, সেদিন দ্বাদশী, গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলার পূজা না হলে পারণ করা চল্‌বে না; পুত্র কি এক জরুরী কাজে কোথায় বেরিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অভাবে তাঁর ঘরে না ফেরা পর্য্যন্ত ঠাকুর পূজা বন্ধ। ব্রাহ্মণের চেয়েও সদাচার ও কঠোর

ব্রত পালন করে' যে গৃহে ব্রাহ্মণ-বিধবার শালগ্রাম শিলাটী ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত নাই, সেখানে নারীত্বের অর্থ শূদ্রত্ব বই আর কি হতে পারে! এদেশের মেয়েদের মনের উপর এই যে শূদ্রত্বের চাপ, এই যে নিত্যি তিরিশ দিন কেবলমাত্র ঘর গিরস্তালির নির্দ্দিষ্ট কাজটী কলের মতন করে চলার মনন-বিহীন জীবনযাত্রা, এরি নামই তো গৃহ-লক্ষ্মীত্ব। এতে করে এদেশের নারীকুল যাদের জননী, তারা এই ধরাতলে ভৃত্যমাত্রই হয়ে রয়েছে, ভর্ত্তা হতে পারে নাই এবং এই অবস্থায় আরো কিছুকাল থাক্‌লে কোনো কালেও পার্‌বে কিনা সন্দেহ।

(২)

বিশ্ব-ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে নারীকে বাদ দিয়ে চলার দরুণ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সমুদায় প্রতিষ্ঠানগুলিই যে বিকলাঙ্গ, আজকের দিনে সকলজাতিরই এই কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্মে রাষ্ট্রে সমাজে সর্ব্বত্রই সাম্য স্থাপনের একমাত্র পুরুষ প্রবর্ত্তিত তন্ত্রের, হার হয়েছে। তাই খৃষ্টানে খৃষ্টানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমান মুসলমানে পরস্পর মৈত্রীর চোটে হিন্দু অহিন্দু, খৃষ্টান অখৃষ্টান, মুসমমান অমুসলমানের ভিতরকার বিদ্বেষ পোষণ ও প্রচারই হয়ে এসেছে, এই হচ্ছে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মুখ্য কাজ। রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তার ভিতরকার একটী কারণ হচ্চে এই—পুরুষের দম্ভভরা ক্ষুরধার বুদ্ধির মুখে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির কঠোরতা যতটা অটুট্ হয়ে টিঁকে থাকতে পারে, তার কোমলতা ও কমনীয়তা প্রায় ততটাই আবর্জ্জনার মতন কাটা পড়ে যায়। আর তারি ফলে বিধি-নিষেধের সরল বিধানগুলি ক্রমাগত

কূট নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে একমাত্র পুরুষেরি পরিচালিত তন্ত্রকে যন্ত্রেরি চলন-উপযোগী করে মাত্র। এক্ষেত্রে নারীর দান যে কি প্রকৃতির হবে—সেটা ঠিক করে বলবার সময় এখনো আসে নাই। কেননা আজ পর্য্যন্ত মেয়েরা ব্যবস্থা প্রণয়ণ ও পরিচালন ব্যাপারে যতটুকু কাজ করে এসেছে, তার বেশীর ভাগেরই প্রেরক-মন্ত্র পুরুষেরই শিখানো বুলি।

কেউ কেউ আবার পশু পাখী প্রভৃতির ইনষ্টিনক্‌টেরি বশবর্ত্তী জীবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, পুরুষের নির্ব্বিচার বশ্যতাই নারীদের পক্ষে প্রাকৃতিক বিধান বলে ব্যাখ্যা করেন। অথচ যখন দেখি অন্যত্র তাঁরাই আবার উচ্চরোলে প্রচার করতে থাকেন—প্রকৃতিকে অতিক্রম করে চলাই মানবতা, আর একমাত্র তারি নিদেশ অনুসারে যে জীবন যাপন, সে হচ্ছে সাধারণ জীবেরই ধর্ম্ম। তখন মুখটী ফিরিয়ে একটু হেসে নেওয়া ভিন্ন আর কোনো উপায়ই দেখি না।

আর এক দলের লোক আছেন, যাঁরা নাকি মেয়েদের শারীরিক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে পুরুষের প্রবল প্রতাপের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে লালিত পালিত হয়ে থাকাকেই নারীর পক্ষে পরম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেন। মেয়েদের স্বাভাবিকই শারীরিক দুর্ব্বলতা আছে কি নাই এবং থাকলেই বা তার কারণ কি, এসব আলোচনার আগেই তাঁদের কাছে আমাদের এই উত্তর যে, গায়ের জোরের উপরেই যে দুনিয়ার আধিপত্যের ভিত্তি নয়, তার প্রমাণ তো মানুষ নিজেই। বাঘ, মোষ, গণ্ডার প্রভৃতি এই সব হোম্‌রা চোম্‌রা নখী-শৃঙ্গীরা থাকতেও যখন দুর্ব্বল মানবই হয়ে বসেছে তামাম দুনিয়ার বাদশা, তখন গায়ের জোর নেই বলে' পরবশ্যতার ওজর একেবারেই টিক্‌তে পারে না।

"সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" এই যে পরম যুক্তির বাণী, একি নারীরও জন্যে নয়? অনেক দিনের অন্ধ-প্রথা ও প্রভুত্বের জড়ভারে তার আত্মা যে মুমূর্ষুপ্রায় একথা তার নিজের যতটা জানা উচিত, ততটা জানবার আগ্রহকে আজো যারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়,—সে কেবল তারা নিজেরাও ঠেকে রয়েছে বলেই। নিজে যে অশক্ত, অপরের শক্তিলাভকে সে সন্দেহের চোখেই দেখে। তাই জাগ্রত-জীবনের যাত্রামুখে তারা যখন পথ আগলে বাধা দিতে দাঁড়ায়, তখন হয় তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচের যতটুকু ত্যাগ করা দরকার, সেটুকু অবশ্য ত্যাগ করতেই হবে, নয় তো নতুন পথ কাটবার মতন বল সঞ্চয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

এদেশের কর্ত্তা-জাতির মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে' পরিচিত, তাঁদেরও পৌনে ষোল আনা লোকই অন্তঃপুরবন্ধাদের নিজেদের বাড়িয়ে তোলার এই ভাবটীকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখেন। সাগর পারের হাওয়ায় আপাতোজ্জ্বল ভাবের এই ফাঁকা ফানুসটী যদিই বা দৈবযোগে আর্য্য-ভূমির পুণ্য আকাশতলে উড়ে এসেছে, একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলেই দেখা যাবে, কিছুকাল জ্বলে জ্বলে শেষটায় আপনা হতেই কখন তা যে নিভে যাবে, তা কেউ টেরও পাবে না। এই হলো তাঁদের বিশ্বাস। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে, নারীর নব জাগরণের গানটীকে বেফাঁক তুড়ি দিয়েই তাঁরা উড়িয়ে দিতে চান। বিশ্বাস অন্ধ, যে জায়গায় একবার হাঁটুগেড়ে বসে, সেখান থেকে সহজে নড়তে চায় না। আমাদের মতন নগণ্যের কথায় বিচক্ষণ কর্ত্তাজাতির বিশ্বাসের কিছুই এসে যাবে না জেনেও, তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন,—এই যে সেদিন কলিকাতা ও

মফঃস্বলের বুকের উপর সভাবন্ধের খামখেয়ালী আইনকে না মেনে চলা নিয়ে এত সব কাণ্ড হয়ে গেলো, তাতে যে সকল পর্দ্দানসীন হিন্দুঘরের বাঙালী-মেয়েরা সাতপুরুষের ঘেরাটোপের খোপ ছেড়ে নিঃসঙ্কোচে নব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কাজের প্রতি বাংলার পনোরো আনা পুরমহিলার অন্তরের অনুমোদন ও সহানুভূতি ছিলো। অবশ্য দিদিমাদের চোখে সেই সব নারীর তেজস্বিতা ও কর্ম্মপটুতা নির্লজ্জ বিবিয়ানার চূড়ান্ত নিদর্শন! কিন্তু দিদিমাদের আমল যে আজ আর নেই, তার প্রমাণ দেশমাতার এই সব অক্লান্ত সেবিকারা যেখানেই উপস্থিত হয়েছেন, অন্তঃপুরবাসিনীদের আদর ও আনন্দের হাসিতে নিজেদের মর্য্যাদাকে উজ্জ্বল করেই ফিরেছেন।

পৃথিবীতে নবযুগ আগতপ্রায় না হলেও, তাকে আহ্বান করবার আয়োজন সংগ্রহের জন্য সকল জাতির ভিতরই আজ অল্প বিস্তর চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার মুখে কোথাও পুরাতন একদম বাদ পড়ে যাচ্ছে, কোথাও বা তাকে নামে মাত্র খাড়া রেখে তার উপর নতুনেরি পূজার সিংহাসন বসান হচ্চে। আজকের দিনেও যদি এদেশের মেয়েরা শিকলটা সোণার বলেই তার উপর অলঙ্কারের গৌরব আরোপ করে, অক্ষমের মুখের গোটাকতক মিষ্ট বচনের মোহে আবিষ্ট থাকে, আর পোষমানা প্রাণের ঝিমন্ত ভাবটীকেই নারীত্ব বলে মেনে নিয়ে, পরম নিশ্চিন্তে খেয়ে শুয়েই কাল কাটায়, তাহলে দু'দিন বাদেই তাদের দেহ মনের এই পঙ্গুত্ব প্রতিকারেরও বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীসোণামাখা দেবী।

আমাদের শিক্ষা-সঙ্কট *

(১)

আপনার লেখা "মারাত্মক একতা" পড়ে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, আপনি বি-মতকে কখনই বয়কট করবেন না, অবশ্য সে বি-মত যদি সত্যি একটা মত হয় আর তা যদি বেনামি না হয়। যাঁরা বয়কটের পক্ষপাতী তাঁরা ভুলে যান যে, মতে মতে সংঘর্ষের ফলে ঠিক মত দাঁড়িয়ে যায়, ভুল মত ভেঙ্গে প'ড়ে। বিরোধী মতের উপর জয়ী না হওয়া তক্ স্বমতের শক্তি কেউ জানতে পারে না। ও পরীক্ষায় যে মত পাস না হয়, তা দুদিনের বেশী টেঁকে না।

তার পর এটা কখনো লক্ষ্য করেছেন যে, মতে মতে সংঘর্ষ হলে অনেক সময়ে সে দুই পৃথক মত পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটা নূতন মতের সৃষ্টি করে—যার ভিতর উভয় মতের গুণ থাকে আর কোনটারই দোষ থাকে না। Thesis ও antithesis মিলেই যে synthesis হয়, হেগেলের এ আবিষ্কার হচ্চে একটা মহা সত্যের আবিষ্কার।

দার্শনিক-তত্ত্বের দিকে পিঠ ফিরিয়েও দেখতে পাই যে, মানুষে নিত্য তর্ক করে; অবশ্য তাদের ভিতর মতভেদ হয় বলে, আর সেই সঙ্গে তারা একমত হতে চায় বলে। মানুষের মনে যতদিন সংশয় বলে একটা জিনিস থাকবে, ততদিন মানুষ তর্ক করবে, আর মানুষের

* আত্মশক্তি হইতে উদ্ধৃত।

মনে সংশয় ততদিন থাকবে, যতদিন সে সব-জান্‌তা না হবে। আর যিনি সব-জান্‌তা তাঁর কিছু বলবার নেই, কেননা তাঁর কিছু শোনবার নেই।

তাই একটা তর্ক তোলা যাক। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে এখন কি ভাঙ্গা উচিত? আপনি অবশ্য একথা স্বীকার করবেন যে, এ বিষয়ে বহুলোক নিঃসংশয়-চিত্ত নন। সুতরাং এটা যথার্থই একটা তর্কের বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমি তর্কের খাতিরে পূর্ব্ব পক্ষ অবলম্বন করছি :—

যা আছে, বিনা কারণে তার অস্তিত্ব নষ্ট করা, আমি বৈধ হিংসা মনে করিনে। আর সত্য কথা বলতে গেলে ইউনিভারসিটী ভাঙ্গবার পক্ষে কোন সুযুক্তি নেই। অতএব এখন বিচার সুরু করা যাক। এ বিচারে হারলে আমি দুঃখিত হব না, কেননা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় যে আদর্শ বিদ্যালয় নয়, তা আমি বিশেষ করেই জানি। তবে ইউনিভারসিটীর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য না থাকলেও তার সঙ্গে আমার সখ্য আছে।

(২)

ইউনিভারসিটীর নিন্দে জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি, অবশ্য ইংরেজের মুখে। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন যে, ওখানে কিছু হয় না অর্থাৎ ছেলেরা লেখা পড়া শেখে না। কেউ বলেন যে, যে লেখাপড়া আমরা ওখানে শিখি, তাতে আমাদের চরিত্র গঠন হয় না। আবার একদল বলেন যে, ইউনিভারসিটীর শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে সব কংগ্রেসওয়ালা। দেশী লোককে বিলেতি শিক্ষা দেওয়া

আর দুধ দিয়ে সাপ পোষা একই কথা, অতএব ও সাপের বাসা ভেঙ্গে ফেল। তার পর আর একদল আমাদের হিতৈষী ইংরেজ আছেন, যাঁরা বলেন, ও-শিক্ষার ফলে আমরা denationalised হই। বিলেতি বিদ্যে পেটে পড়লেই নাকি দেশী মনে বিলেতি নেশা ধরে, আর তখন আমাদের মনোজগতে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে। আমাদের এই বিদেশী হিতৈষীরা চান না যে, আমাদের স্বদেশী আত্মা মাথায় হাঁটে, তাই তাঁরা আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার how do you do করিয়ে দিতে চান। এর নাম orientalism.

অতঃপর আমরাও বল্‌তে সুরু করলুম যে ইউনিভারসিটি আমাদের আত্মার মাথা খেয়ে দিচ্ছে। ওখানে শিক্ষা পেলে প্রথমতঃ আমরা denationalised হই, আর তার ফলে আমাদের মনে দাসভাব জন্মায়, সংক্ষেপে আমরা যুগপৎ সাহেব ও মোসাহেব বনে' যাই; অতএব সরকার যদি ইউনিভারসিটি বন্ধ না করেন, তবে আমরা সেখানে ছেলে পাঠান বন্ধ করব। আমরা চাই ন্যাসনাল এডুকেশন তা ছাড়া আর কিছু চাইনে কেননা আমরা চাই re-nationlised হতে।

এ সব মত আমি যে ষোল আনা শিরোধার্য্য করতে পারি নি তার কারণ এসব মত পরস্পর বিরোধী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইউনিভারসিটি একাধারে hot bed of sedition এবং গোলামখানা হতে পারে না। এবং এ দুয়ে মিলে একও হতে পারে না। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলে, যে—"পরস্পর বিরোধেহির্ন-প্রকারান্তস্থিতি"—অর্থাৎ যা পরস্পর বিরোধী তা পরস্পর বিরোধীই থেকে যায়, তারা অন্যপ্রকারে থাকতে পারে না। জর্ম্মান লজিকে

শুনি এর উল্টো কথা আছে কিন্তু আমি জর্ম্মান জানিনে আর যে লজিকে—"হয় নয়" এক হয়ে যায় সে লজিক থাকা না থাকা দুই সমান।

(৩)

সে যাই হোক, আমি national education কথাটাকে ভক্তি করি, কারণ ও-কথার উৎপত্তি ভাঙ্গবার প্রবৃত্তি থেকে জন্মায় নি, গড়বার প্রবৃত্তি থেকে জন্মেছে, তবে যে আমাদের দেশী বিলেতি জাতীয় শিক্ষার প্রচারকের দল ঐ ভাঙ্গবার দলে জুটেছেন, তার কারণ তাঁরা কোন্ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় তা জানেন, কিন্তু কোন্ শিক্ষা দেওয়া উচিত তা জানেন না। জানেন না এই জন্যে যে, উক্ত যুক্ত পদটীর চার রকম ব্যাখা হয়। যথা—(১) National education হচ্ছে সেই শিক্ষা যা ন্যাসনালও নয় এডুকেশনও নয় (২) যা ন্যাসনাল বটে কিন্তু এডুকেশন নয় (৩) যা এডুকেশন অথচ ন্যাসনাল নয় (৪) যা যুগপৎ ন্যাসনাল ও এডুকেশন।

বলা বাহুল্য এই চতুর্থটীই হচ্ছে গড়বার জিনিষ, কিন্তু সেটী যে কি, অদ্যাবধি কেউ তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত এবিষয়ে যা কিছু বলা কওয়া হয়েছে সে সব যুক্তি তর্ক যে উপরোক্ত প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত তা এতই প্রত্যক্ষ যে, সে সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তার পর জাতীয় শিক্ষার যে সব স্কুল-কলেজ গড়া হয়েছে, সে সবই যে সরকারি স্কুল-কলেজের এক-জাতীয় জিনিষ তা এক পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। এর কারণ

জাতীয় শিক্ষা কেউ রাতারাতি গড়তে পারে না—ও কালক্রমে আপনি গড়ে' ওঠে। ব্যাসকাশি অবশ্য একদিনে গড়া যায়, কিন্তু সেখানে মানুষ গাধা হয়, শিব হয় না।

একদিকে বিলেতি ইম্পিরিয়ালিষ্ট আর একদিকে দেশী ন্যাশনালিষ্ট, দুধার থেকে এই দু-দলের আক্রমণ সত্ত্বেও ইউনিভারসিটি যে টিকে আছে, তার কারণ দেশে তার কোনও মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। National Education আজ তক্ শব্দকায় মাত্র। আর শব্দের ধাক্কায় বস্তু ওলটায় না।

তা হলেও national education-এর আদর্শ আমরা ছাড়তে পারিনে কেননা ঐ হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র আদর্শ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই national education আছে, এক আমাদের দেশ ছাড়া। অর্থাৎ পৃথিবীর অপরাপর দেশে জাতীয় বুদ্ধি ও জাতীয় অবস্থা এই দুয়ের যোগাযোগে সে দেশের education গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাস উল্টো, তাই তা ডানদিক থেকে পড়তে হয়।

আমাদের দেশে রয়েছে ইউনিভারসিটি, আর আমরা চাই national education। আমাদের শিক্ষার এই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। এখন আমার বিবেচনায় এ সমস্যার সমাধান সহজেই হয় যদি, আমরা ইউনিভারসিটিকে nationalise করতে পারি, অর্থাৎ ইউনিভারসিটির দেহে যদি আমাদের আত্মা ঢুকিয়ে দিতে পারি, বররুচি যেমন বৈয়াকরণ-ব্যাড়ীর আত্মা মগধরাজের দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এর সমগ্র বিবরণ কথা-সরিৎ-সাগরে পাবেন।

যদি বলেন যে ইউনিভারসিটির আত্মা ও জাতীয়-আত্মা এতটা

পৃথক যে ও দুয়ের যোগ কিছুতেই হবে না। তার উত্তরে আমি বলব যে ও দুই যদি পরস্পর thesis ও anti-thesis হয়, তাহলে তাদের synthesis হতে বাধ্য।

তবে এ পরিণতি হতে পারে, যদি ইউনিভারসিটির দেহটি বজায় থাকে। তা থাকবে কি না বলা কঠিন। ইউনিভারসিটি যে সুস্থ নয়, এবং তার চিকিৎসা যে করা দরকার এ বিষয়ে অনেকে একমত। তাই আমাদের রিফরম কাউন্সিল ইউনিভারসিটির চিকিৎসার ভার হাতে নিয়েছেন, কিন্তু সে চিকিৎসায় তার রোগত্যাগ হবে, কি দেহত্যাগ হবে, তা মা গঙ্গাই জানেন।

এ চিকিৎসায় ঔষধ-পথ্যের নামগন্ধও নেই, আছে শুধু লঙ্ঘনের ব্যবস্থা। তাতেই ত ভয় হয়।

আর একটি কথা বলেই এ বিচার বন্ধ করব। শিক্ষার প্রতি দেশের মন আজ চটে গেছে সুতরাং সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শিক্ষা হচ্ছে মনের জলবায়ু, যতক্ষণ তা আছে ততক্ষণ মানুষে তার মূল্য বোঝে না, তার অভাবেই আমরা খাবি খাই।

বীররল।

৮ই জুন, ১৯২২।

আমাদের শিক্ষা-সঙ্কট *

(২)

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে, ইউনিভারসিটির পরমায়ু ফুরিয়েছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় নাকি বেশির ভাগই অপব্যয়। তাই আমাদের education minister ইউনিভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু কিঞ্চিৎ দেন ত সে টাকার কান আঁচড়ে (ear marked করে) দেবেন। ইউনিভারসিটি ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্ণমেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলবে না।

আমাদের education minister ইউনিভারসিটির উপর কোন-রূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co-operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দেখছি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা হচ্ছে এই—

"আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয়, তা তুমি বুঝবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে স্থূলদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয়, অপরের মতে তা অপব্যয় হতে পারে।

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

আমার মতে minister‌দের যে মাইনে দেওয়া হয়, তার ষোল আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্ আমার কোন ব্যয়টা সদ্ব্যয় আর কোনটি অপব্যয়, সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই।* আমি যে রকম ভাল বুঝি, সেই রকম খরচ করবার অধিকার আইনত আমার আছে। হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি হচ্ছে স্বরাট।"

এর উত্তরে minister মহাশয় বলেন ঃ—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর। আর তা যদি না মানতে চাও ত মেনো না, একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি, অতএব কে কার অধীন, তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে, মনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে তার কপালে উপবাস অনিবার্য্য, আর তার ফল মৃত্যু। তাই ইউনিভারসিটি প্রায়োপবেশন করবে সংকল্প করেছে।

অতএব এটা নিশ্চিত যে রিফরম কাউনসিলের প্রথম এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভারসিটী ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যের সহায় হবে, কেননা এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ, তাই একটা কিছু ভাঙ্গা হচ্ছে দেখলেই লোকে খুসি হবে। ও বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকজন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায়, সেটাই হচ্ছে আপাতত আসল ভাবনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি, আশা করি বাঙলার

বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আরজি বিনা বিচারে ডিসমিস করবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(২)

(১) ইউনিভারসিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকদের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড়বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকেরা পেটেন্ট ঔষধ বানান—ওতে দু-পয়সা আছে, physics-এর অধ্যাপকেরা বিজলী বাতি, বিজলী পাখার মিস্ত্রি হোন, আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন আর তাও যদি না পারেন ত খবরের কাগজ লিখুন। বাকী থাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার, অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহলে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে, কতক জেলে, কতক পাঠশালায়, কতক পশুশালায়, কতক হাটে, আর কতক মাঠে। হটে, গোল করবার জন্য আর মাঠে, গুলি-ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্র পাতি সব যাদুঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কাল স্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দুদলের উপকার করা হবে—এক জনগণের, আর আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐসব ত্রিভঙ্গ বিভঙ্গ অপরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিনতে পারবে যে ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার

যাদুর যন্ত্র-তন্ত্র, আর ওরই ভিতর মানুষের জিওনকাঠি মরণ-কাঠি দুই লুকানো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐসব কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সব উদ্ধার করবেন, এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও জায়গা হবে না, এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পূরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীও তদ্রূপ হওয়া উচিত। তবে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে পাঁজিপুঁথির অগ্নি সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কু-সংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিদ্যাদাহের মুরদাফরাস দেশে ঢের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে, মাধববাবুর বাজারের অন্তর্ভূত করা হোক। ইউনিভারসিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত; অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের টাকা আয় হবে। আমার বিশ্বাস ও ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নূতন minister অর্থাৎ fish market minister এর মাইনে দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে, ইউনিভারসিটি কলেজে একটি নতুন পুলিসকোর্ট বসান হোক্। এ বিষয়ে নজির আছে। ডফ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে জোড়াবাগান পুলিস কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজির অনুসারে, ইউনিভারসিটি কলেজকে, গোলদিঘি

পুলিসকোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদিঘির ধারে যে একটা পুলিসকোর্ট থাকা দরকার একথা বোধ হয় কোনও মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশা করি Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করবেন। ইতি

বীরবল।

৪ঠা জুন, ১৯২২।